দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

সে-যুগে মায়েরা বড়ো

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নালন্দা

জ্ঞাতব্য লেখকের পরিবারের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত
প্রকাশক রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা, ৬৯ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
মুদ্রণ অনিন্দ্য প্রিন্টার্স ঢাকা
বর্ণবিন্যাস নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য ১০০.০০ টাকা মাত্র।

Se-Yuge mayera Baro Debiprasad Chattapadhyay
Cover Design Dhruba Esh
First Published February 2009
Publisher Redwanur Rahman Jewel
Nalonda 69 Payridas Road
Banglabazar Dhaka-1100
Phone 0155-456919
Price 100.00 Only
ISBN 984 70093 0031 8
E-mail nalondaa@yahoo.com

উৎসর্গ

পরম স্নেহের লেখিকা
গীতারাণীর
করকমলে
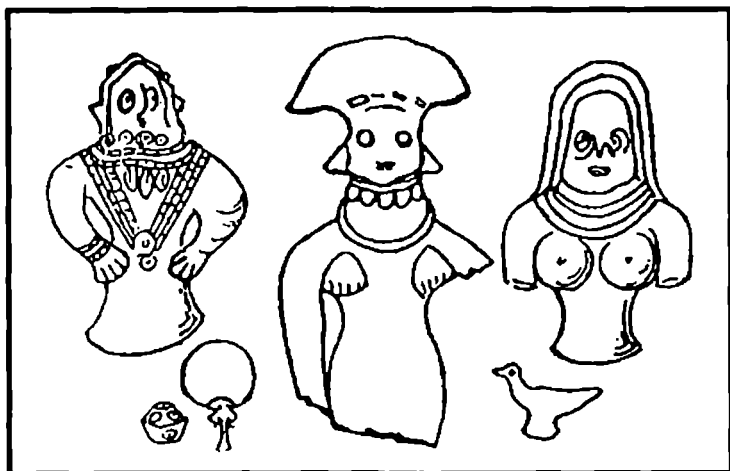
সিন্ধু সভ্যতার মাতৃমূর্তি
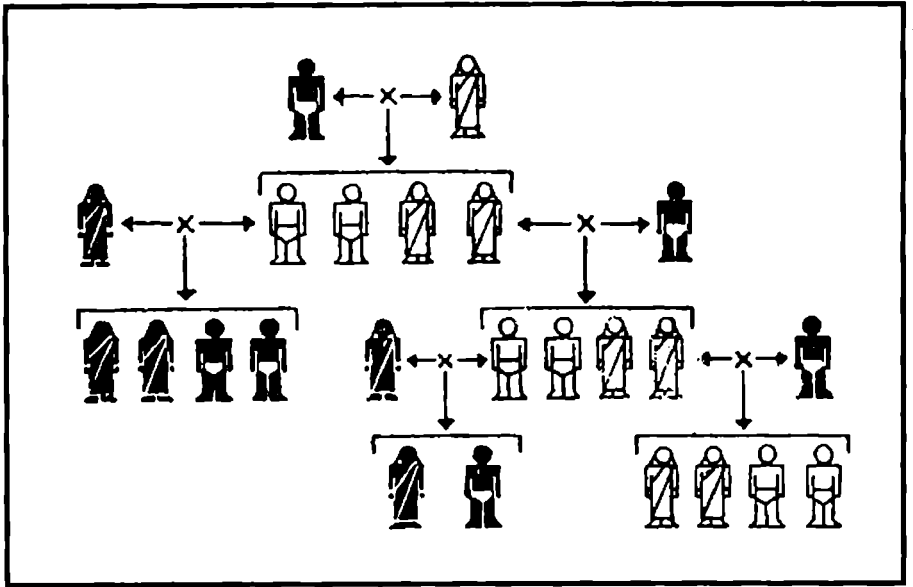
মাতৃপ্রধান সমাজের বংশ-পরিচয়; সন্তানেরা মার বংশ পাচ্ছে, বাবা তাদের কাছে ভিন্ন বংশের মানুষ – অনাত্মীয়ের মতো।
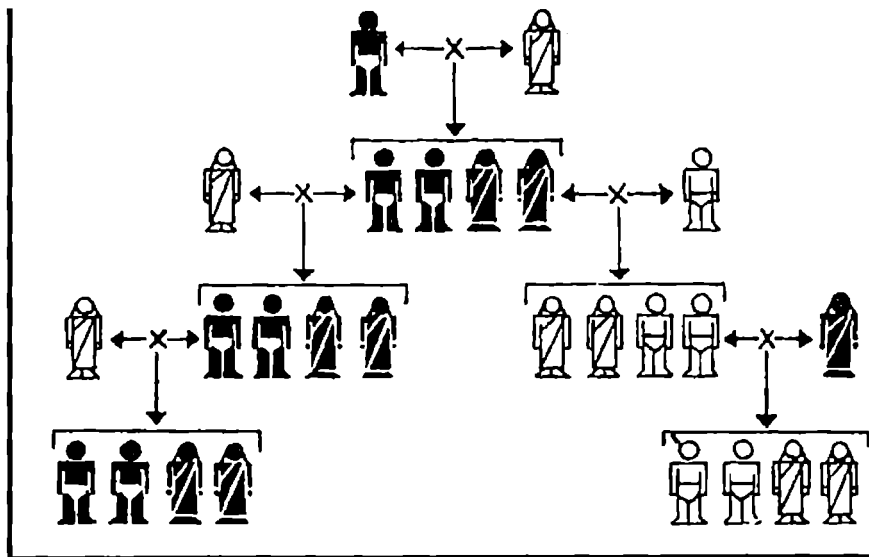
পিতৃপ্রধান সমাজের বংশপরিচয় : সন্তানেরা বাবার পরিচয় পাচ্ছে।
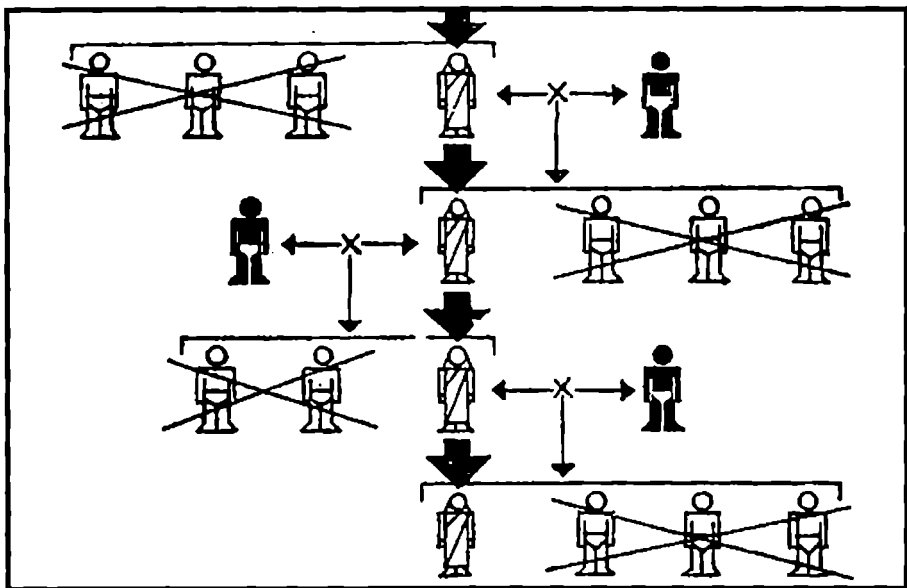
খাঁটি মাতৃপ্রধান সমাজের উত্তরাধিকার– মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পাচ্ছে, সম্পত্তিতে ছেলেদের কোন অধিকার নেই।
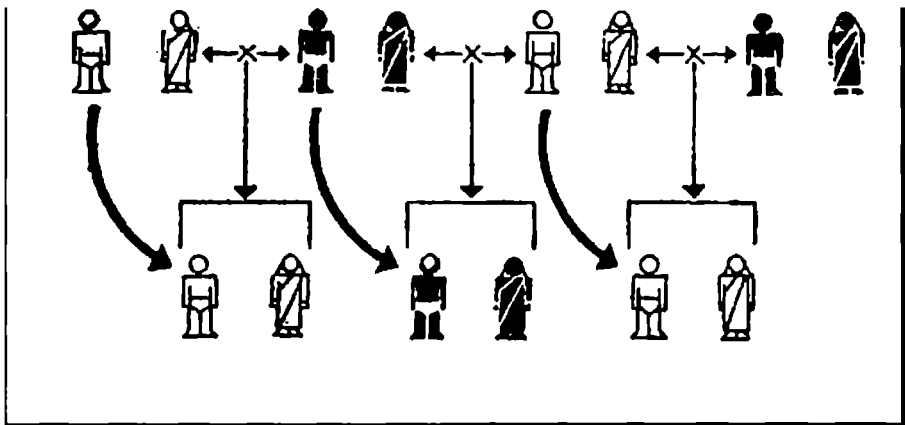
মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজের দিকে যাবার প্রথম অবস্থা : মামার সম্পত্তি ভাগনেপাবে।
খাসিয়া আর আমেরিকার ইরোকোয়াদের বেলায় আজো এইরকম।
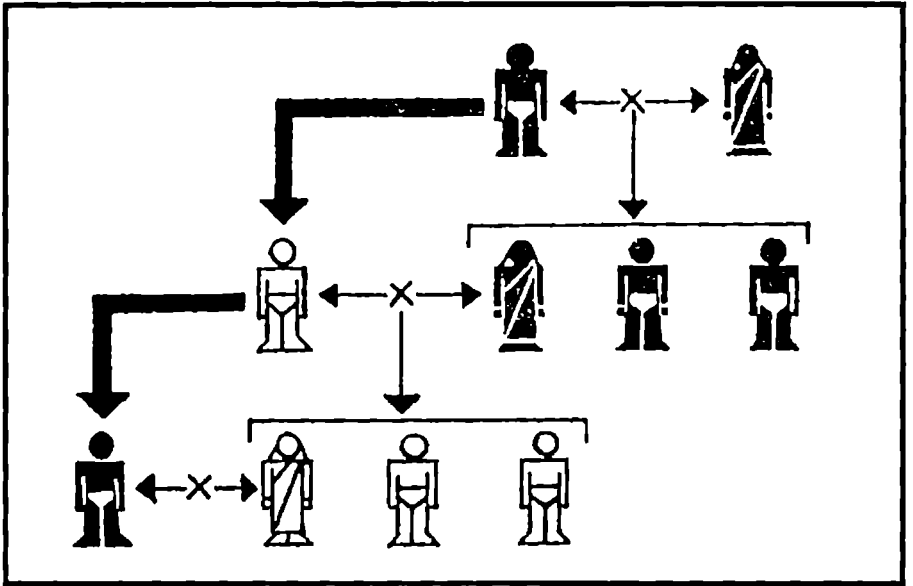
মাতৃপ্রধান সমাজে আরো ভাঙ্গন ধরার অবস্থা–শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই পাবে। রোমান রাজাদের বেলায় এই রকম ছিল।

খাঁটি পিতৃপ্রধান সমাজ–বাবার সম্পত্তি ছেলে পাবে, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার নেই।
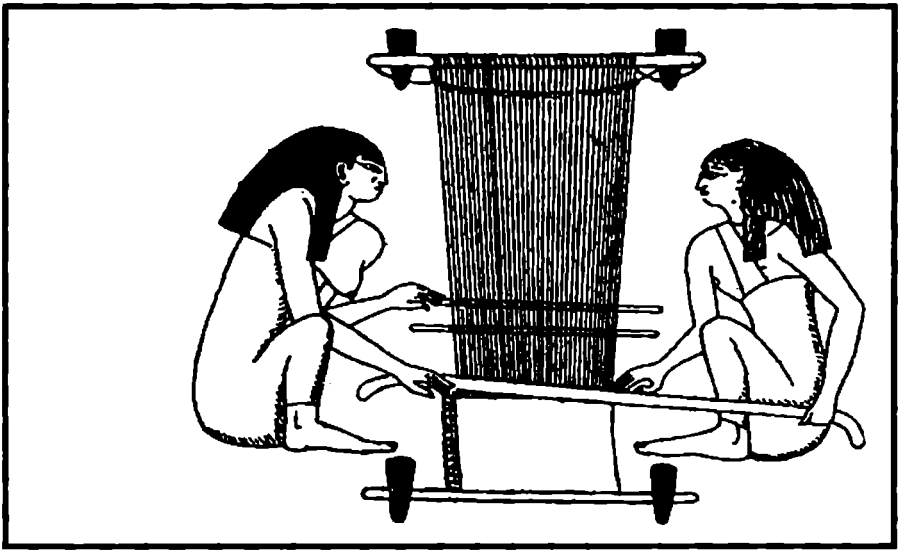
কৃষি আবিষ্কারের আনুষঙ্গিক হিসেবে বয়নশিল্পও মেয়েদের আবিষ্কার এই ছবিটি প্রাচীন মিশরের।

নীলনদের কিনারায় প্রাচীন মিশর। সিন্ধুর কিনারায় মোহেনজোদারো, ইরাবতীর কিনারায় হরপ্পা নগর। এসব হলো পুরোনো কয়েকটি বিস্ময়কর আর অপরূপ চিহ্ন। এই রকমেরই আরো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায়, তাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস বলে দুটি নদীর কিনারায়।

কে গড়েছিল? মানুষ।

কিন্তু মানুষ না শুরু করেছিলো একরকম আধা-জনোয়ারের মতো বন্য অবস্থা থেকেই? তা করেছিলো। ওইরকম আধা- জানোয়ারের মতো অবস্থা থেকে শুরু করেও মানুষ কিনা এতোদূর এগিয়ে এলো যে তারই হাতে গড়া অমন অপরূপ কীর্তিতে ঝলমল করে উঠলো পুরোনো নানান কেন্দ্র! শুধু কি তা-ই? তারপর, যুগের পর যুগ ধরে মানুষ আরো এতো এগিয়েছে, গড়ে তুলেছে আরো এতোসব অপরূপ কীর্তি, যে তার পাশে পুরোনো পৃথিবীর ওই অপরূপ চিহ্নগুলি আজও যেন ছেলেখেলার মতোই মনে হয়।

আরো একটা মজার কথা বলি : যে সুদীর্ঘ যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে মানুষের বাস তার তুলনায় মানুষের পক্ষে এতোসব চোখ-ধাঁধানো কীর্তির যুগটা নেহাতই যেন চোখের পলক। কীরকম, তার হিসেবটা করা যাক।

এক আজব-ঘড়ির হিসেব

ধরা যাক, একটা অদ্ভুত ঘড়ি বানালাম—আমার হাত-ঘড়িটার মতো তারও বারোটা ঘর, কিন্তু তার কাঁটা আমার হাতঘড়ির তুলনায় অনেক আস্তে আস্তে নড়ে। আমার হাতঘড়ির ছোটো কাঁটাটা এই বারোটা ঘর ঘুরে আসতে মাত্র বারো ঘণ্টা সময় নেয়, কিন্তু যে-ঘড়িটা বানালাম তার ছোটো কাঁটাটা বারোটা ঘর ঘুরে আসতে সময় নেবে ২৪০,০০০ বছর—দুশো চল্লিশ হাজার বছর। তার মানে, আমাদের ঘড়ির এক ঘণ্টা ও-ঘড়ির বিশ হাজার বছরের সমান হবে, আমাদের ঘড়ির এক মিনিট ও-ঘড়ির তিনশো-তেত্রিশ বছর চার মাসের সমান হবে।

আমরা ওই অদ্ভুত ঘড়িটির হিসেব দিয়েই পৃথিবীর বুকের ওপরে মানুষের ইতিহাসকে বোঝবার চেষ্টা করবো।

পৃথিবীতে ঠিক কতোদিন আগে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে? এ-প্রশ্নের একেবারে নিখুঁত হিসেব অবশ্য কেউই দিতে পারেন না। তবু, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ থেকে প্রায় আড়াইশো হাজার বছর আগে মোটামুটি মানুষের মতো এক জীবকে পৃথিবীর বুকের ওপরে ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু, হিসেবের সুবিধের জন্যে আমরা আড়াইশো হাজার বছর না ধরে দুশো চল্লিশ হাজার বছরের কথাই ধরি।

আমাদের ওই আজব ঘড়ি অনুসারে এই ২৪০,০০০ বছরের হিসেবটা কীরকম হবে? বারো ঘণ্টার হিসেব। ও-ঘড়ির রাত বারোটায় যদি পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে তা হলে এখন,—আজকের দিনে,—সে-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুপুর বারোটা বাজছে। মনে আছে তো, এ-ঘড়ির ছোটো কাঁটা এক ঘণ্টার পথ সরতে বিশটি হাজার বছর সময় নেয়; এ-ঘড়ির হিসেবে পৃথিবীর বুকের ওপর আজ পর্যন্ত মানুষের যতো কিছু লীলা তা মোট বারো ঘণ্টার ব্যাপার।

এই বারো ঘণ্টার মধ্যে প্রথম সাড়ে-এগারো ঘন্টা ধরে মানুষের যে-জীবন সে-সম্বন্ধে বলবার মতো কথা বিশেষ কিছুই নেই; হন্যের মতো মানুষ বনে-জঙ্গলে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছে, সম্বল বলতে দু-

চারটে পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার মাত্র। তাই, মোট বারো ঘন্টার মধ্যে প্রথম সাড়ে এগারো ঘন্টা ধরে মানুষের কীই-বা কার্তি!

কিন্তু তারপর যেন হঠাৎ মানুষের অগ্রগতি শুরু হলো একেবারে হুড়মুড় করে। কীরকম তার হিসেবটা দেখা যাক!

মিশর, মোহেনজোদারো, ব্যাবিলোন–এসব কতোক্ষণ আগেকার কথা? আমাদের ওই ঘড়ির মাত্র মিনিট উনত্রিশ আগেকার হবে। গৌতম বুদ্ধর যুগ? এই তো সবে মিনিট আষ্টেক হলো। যিশুখ্রিষ্টর জন্ম? এখনো ছ মিনিট হয়নি। মিনিটখানেক আগেও ইংল্যান্ডে মধ্যযুগের অবসান হয়নি। পলাশীর যুদ্ধ সবে চল্লিশ সেকেন্ড হলো–তারপর আমাদের দেশ থেকে রাশিরাশি ধনরত্নন লুট করে নিয়ে গিয়ে ইংরেজরা নিজেদের দেশে শিল্প-বিপ্লব করবে।

এইভাবে যদি ভাবতে রাজি হই তা হলে দেখবো আমাদের ওই আজব-ঘড়ির গত আধ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের ইতিহাসে যেসব প্রকাণ্ড আর প্রচণ্ড ঘটনা ঘটেছে তার তুলনায় আগেকার সাড়ে এগারোটি ঘণ্টা ধরে মানুষের নেহাতই একঘেয়ে আধবুনো অবস্থা মাত্র!

আলাদিনের প্রদীপের চেয়ে আশ্চর্য?

তাই বলছিলাম, বহু হাজার বছর ধরে একঘেয়ে আধবুনো অবস্থায় কাটাবার পর মানুষ যেন হঠাৎ হুড়মুড় করে এগিয়ে চলতে শুরু করলো–আগেকার মন্থরতার তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমের তাড়াতাড়ি বদলে দিতে লাগলো পৃথিবীর চেহারাটা।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হলো কী করে? মানুষ কি হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিলো কোনো-এক আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ?

না। আলাদিনের প্রদীপ নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক আশ্চর্য আর অনেক অপরূপ এক আবিষ্কার।

কী আবিষ্কার?

তার নাম কৃষিকাজ। তার নাম চাষবাস। সে-আবিষ্কার হলো মাটির বুকে ফসল ফলাতে শেখা।

কিন্তু কৃষিকাজ বা চাষবাস আবিষ্কার এমন আশ্চর্য ব্যাপার হলো কেন? সেই কথাটিই তো খুলে বলতে বসেছি। সেকথা শুরু করবার আগে আবার বলে রাখি, পৃথিবীর বুকের ওপরে মানুষের পুরো ইতিহাসের তুলনায় এ-আবিষ্কার খুব বেশিদিন আগেকার নয়—আমাদের ওই আজব-ঘড়ির হিসেব অনুসারে মাত্র আধ-ঘণ্টাখানেক আগেকার ব্যাপার হবে!

খাদ্য-আহরণ থেকে খাদ্য-উৎপাদন

কৃষিকাজ আবিষ্কার মানুষের জীবনে যে কতো বড়ো এক বিপ্লব তা একটি কথা থেকেই ঠাহর করতে পারা যাবে : এই আবিষ্কারের দরুন পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই একেবারে বদলে গেলো, অন্য রকমের হয়ে গেলো।

কীরকম বদল?

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বুকের ওপর টিকে থাকতে গেলে মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম দরকার হলো খাবারের। না-খেলে মানুষ বাঁচবে কী করে?

কিন্তু মানুষের জন্যে এই যে খাবার, এ তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে আসবে না; পৃথিবীর কাছ থেকেই তা যোগাড় করতে হবে। কিন্তু এই যোগাড় করবার ব্যবস্থাটা দুরকমের হতে পারে।

এক রকমের নাম, খাদ্য আহরণ। আর এক রকমের নাম, খাদ্য উৎপাদন।

এই দুরকম ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ—আর তারই দরুন আকাশ-পাতাল তফাত পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও।

কৃষি-আবিষ্কার হবার আগে পর্যন্ত কীরকম? মানুষের অবস্থাটা পরগাছার মতো, পরজীবীর মতো। পৃথিবীতে যা রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে, কোনোমতে তাই-ই সংগ্রহ করে বা আহরণ করে, মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করছে; হয়তো বনজঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ফল-মূল আহরণ করবার চেষ্টা করছে, হয়তো নদীর ধারে ধারে শামুক-গুগলি, কাঁকড়া

আর মাছ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আরো কিছুকাল পরে হয়তোবা শিখেছে বনের পশুপাখি শিকার করতে।

অর্থাৎ কিনা, এককথায়, পৃথিবীতে যা রয়েছে তাই-ই যোগাড় করবার চেষ্টা, তাই-ই যোগাড় করে কোনোমতে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা; অন্য জানোয়ারদের তুলনায় মানুষের পক্ষে এই যোগাড় করবার কায়দা-কানুন নিশ্চয় অনেক উন্নত হয়েছিল; কিন্তু তা হলেও মোটের উপর, মানুষের অবস্থাটা তখনো পৃথিবীর মুখ চেয়ে বাঁচাই।

কৃষিকাজ আবিষ্কার করতে পারবার পর থেকে কিন্তু একেবারে অন্যরকম। মানুষ আর পরগাছার মতো বা পরজীবীর মতো পৃথিবীর আর-পাঁচটা তৈরি জিনিসের ওপর নির্ভর করে বাঁচবার চেষ্টা করছে না; তার বদলে পৃথিবীকে বদলে দিচ্ছে, পৃথিবীতে যা ছিলো না তা-ই সৃষ্টি করছে, পৃথিবীকে আনছে নিজের আয়ত্তে। কেননা, এখন থেকে সে পৃথিবীর বুকের ওপরে ফসল ফলাতে শুরু করেছে, সৃষ্টি করতে শুরু করেছে নিজের দরকারমতো খাবারটুকু।

খাদ্য-আহরণ ছেড়ে খাদ্য-উৎপাদন—আর তারই দরুন পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা বদলে গেলো : পৃথিবী আসতে লাগলো মানুষের আয়ত্তের মধ্যে, মানুষ আর পৃথিবীর মুখ চেয়ে বাঁচতে বাধ্য নয়।

তাই, মানুষের ইতিহাসটা বোঝবার ব্যাপারে ওই কৃষিকাজ আবিষ্কার অতো গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষিকাজ আর পশুপালন

নিজেদের জন্যে খাবারের সরবরাহ বাড়াবার ব্যবস্থা হিসেবে খুব প্রাচীনকালের মানুষই আরো একটি ব্যবস্থা শিখেছিলো। তার নাম, পশুপালন : বনের পশুকে পোষমানিয়ে নিজেদের আস্তানায় আটকে রাখা, এই পশুর দল বাচ্চা পাড়তে-পাড়তে সংখ্যায় অনেক বেড়ে যাবে আর তাদের কাছ থেকে মানুষ পাবে মাংস, দুধ, চামড়া, হাড়!

মানুষ আগে চাষবাস শিখেছিলো? না, আগে পশুপালন করতে শিখেছিলো? না, দুরকম ব্যবস্থাই শিখেছিলো একসঙ্গে?—এইসব প্রশ্ন নিয়ে আজকালকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

কোনো কোনো পণ্ডিত বললেন, আগে কৃষিকাজ, পরে পশুপালন—পশুপালনের চেয়ে কৃষিকাজ অনেক পুরোনো আবিষ্কার। প্রমাণ? প্রমাণ হিসেবে এঁরা বলেন, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজও যেসব মানুষের দল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকা রয়েছে তাদের কারুর কারুর বেলায় দেখা যায় শুধুমাত্র কৃষিকাজের উপর নির্ভর করেই বাঁচবার চেষ্টা চলেছে—তাদের জীবনে পশুপালনের পরিচয় নেই। তাই, এদের দেখলেই বোঝা যায় পশুপালন না শিখেও মানুষ চাষবাস শিখতে পারে। আর-একদল পণ্ডিত বলছেন, আগে পশুপালন পরে চাষবাস। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে খুব কিছু জোরালো কথা এঁরা বলতে পারেন না। তাই এঁদের দলটা তেমন ভারী নয়।

আর একদল পণ্ডিত বলছেন, আগে পশুপালন না আগে চাষবাস—এরকম একটা প্রশ্ন তোলাই ভুল। কেননা, পৃথিবীর সব জায়গার অবস্থা সমান নয়। কোথাও বা পোষ মানাবার মতো পশুর যোগান বেশি, কোথাও-বা চাষবাস করবার পক্ষে জমিটা ভালো। তাই, কোনো জায়গার মানুষ আগে পশুপালন করতে শিখেছে, কোনো জায়গার মানুষ আগে চাষবাস করতে শিখেছে।

অবশ্য, কোন মতটা ঠিক আর কোন মতটা ভুল, এখনো সেকথা খুব জোর করে বলবার উপায় নেই। কিন্তু মোটের ওপর আমাদের মনে হয়, এই শেষ মতটা মানাই ভালো। কেননা, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, তা না হলে পুরোনো পৃথিবীর অনেক কথাই বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

এইখানে, চাষবাস আর পশুপালন শেখবার কথাটা আরো একটু খুলে বলা দরকার। নইলে পরে কতকগুলো কথা বোঝবার ব্যাপারে খটকা থেকে যাবে।

আমরা এ-ব্যাপারে কোন যতটা মানলাম? যে-মত অনুসারে মানুষ আগে পশুপালন শিখেছে, না, কৃষিকাজ শিখেছে তা নির্ভর করছে

প্রাকৃতিক অবস্থার ওপরে : পৃথিবীর যেসব জায়গায় পোষ মানাবার মতো পশুর যোগান বেশি সেখানকার মানুষ আগে পশুপালন শিখেছে; যেসব জায়গায় চাষের পক্ষে উপযুক্ত জমি বেশি সেখানকার মনুষ আগে চাষবাস করতে শিখেছে।

যারা আগে চাষবাস শিখলো তারা যে আর কখনো পশুপালন শিখলোই না—এমন কথা মনে করা কিন্তু একেবারে ভুল। বরং, একটু পরেই আমরা দেখতে পাবো, চাষবাস শিখতে পারার দরুন পশুপালন করবার সুযোগ সত্যিই বেড়ে গেলো! কেননা, চাষবাস শিখতে পারলে খড়-ভুষির যোগান পাওয়া যায়, আর এই খড়-ভুষি খাইয়েই গৃহপালিত পশুদের বাঁচিয়ে রাখা অনেক সহজ। তাই দেখা যায়, কৃষিজীবীরা ক্রমশই পশুপালনও করছে—এমনকি, ক্রমশই তারা গৃহপালিত পশুদেরও নিযুক্ত করছে চাষবাসের কাজে; হালে বলদ জুতে চাষ করলে অনেক বড়ো ক্ষেত চষা যায়, অনেক ভালো করে চাষবাস করা যায়। কিন্তু শুরুতেই মানুষ এইভাবে হালে বলদ দিয়ে চাষ করতে শেখেনি; তাও বদলে নিড়েনি দিয়ে ছোটো ছোটো খেত কুপিয়ে চাষ করতো। তাই, কৃষিকাজ শেখবার দরুন যেমন পশুপালন করবার সুবিধে হলো তেমনিই আবার পশুপালন শেখবার দরুন শেষ পর্যন্ত কৃষিকাজও অনেক উন্নত হলো।

আর, যারা চাষবাস করতে শেখবার আগেই পশুপালন শিখলো, তাদের কথা? তাদের মধ্যে কোনো কোনো দল প্রধানতই পশুপালক হয়ে রইলো। গৃহপালিত পশুই তাদের কাছে প্রধান সম্পদ হলো। আজও এরকম মানবদলের পরিচয় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়নি। আবার এই পশুপালকদের মধ্যে কোনো কোনো মানবদল পরে চাষবাসও করতে শিখলো। কিন্তু এরা স্বভাবতই বাষবাসের প্রথমধাপ থেকে শুরু করেনি। নিড়েনি দিয়ে মাটি কুপিয়ে চাষবাস শুরু করবার বদলে সরাসরি হালে গৃহপালিত পশু জুতে চাষবাস করতে শুরু করলো। তবে, একথা খুব সম্ভব সত্যি যে এই চাষবাসের কায়দাটা পশুপালকেরা নিজেরা আবিষ্কার করেনি—যারা ইতিপূর্বেই কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিলো, কৃষিকাজের উন্নতি করে চলেছিলো, খুব সম্ভব তাদের কাছ থেকেই পশুপালকেরা পরে

চাষবাস করতে শিখেছিলো। অবশ্য আগেই বলেছি, কোনো কোনো মানবদল বিশুদ্ধ পশুপালকই হয়ে রইলো–তারা আর চাষবাস শিখলোই না।

এই কথাগুলি ভালো করে মনে না রাখলে পুরোনো পৃথিবীর অনেক রহস্যই বুঝতে পারা যাবে না।

আবার সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, পশুপালনের তুলনায় কৃষিকাজ ঢের বেশি গুরুতপূর্ণ আবিষ্কার। কেননা, এই কৃষিকাজ আবিষ্কারের দরুনই মানুষ শেষ পর্যন্ত সভ্য হয়ে উঠতে পারলো।

কৃষি-আবিষ্কারের ফলে

খাদ্য-আহরণ ছেড়ে খাদ্য-উৎপাদন করতে শেখার দরুন মানুষ যে কতোখানি মুক্তি পেলো প্রথমে এই কথাটি ভালো করে বোঝা দরকার। কেননা, এইভাবে মুক্তি না পেলে মানুষ বন্য দশা ছেড়ে ক্রমশ সভ্যতার দিকে এগুতেই পারতো না।

খাদ্য-আহরণ সারা বছরের কাজ, বছরের প্রতিটি দিনের কাজ–ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই, অবসর নেই, অবকাশ নেই। ফলমূল যোগাড় করাই বলো আর শিকার করাই বলো–মানুষের দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থা। কেননা, এইভাবে আহরণ-করে-আনা খাবারের পরিমাণ এমন কিছু বেশি হতে পারে না যে মাসের পর মাস ধরে তা-ই খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

কৃষিকাজের বেলায় কিন্তু একেবারে অন্য কথা। সারাটা বছর ধরেই চাষবাস করবার দরকার নেই; শুধুমাত্র বছরের একটা বাঁধাধরা সময়েই চাষবাস করতে হবে। বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত এই সময়টুকু অবশ্য বিশ্রাম নেই, অবসর নেই। কিন্তু তারপর সুদীর্ঘ অবকাশ। পুরো বছরের মতো ফসল গোলায় তুলতে পারলে আগামী বছর ফসলের সময়টুকু পর্যন্ত তারই ওপর নির্ভর করে বাঁচা যাবে–তাই অবকাশ, অবসর, ছুটি।

এই অবকাশের কথাটা কিন্তু খুবই জরুরি। কেননা, সারাটা বছরই যদি খাবারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় তা হলে মানুষের পক্ষে খাবার যোগাড় করা ছাড়া আর কোনো দিকেই মন দেবার প্রশ্ন ওঠে না। কৃষিকাজ আবিষ্কার হবার পর মানুষ বছরের বেশির ভাগ সময়টা ধরেই মুক্তি পেলো, মুক্তি পেলো শুধুমাত্র খাবারের আশায় ঘুরে বেড়ানোর বাধ্যতা থেকে।

অন্য কাজ বলতে কী ধরনের? ঘট তৈরি, কাপড় বোনা, কুঁড়েঘর বাঁধা,– এইরকমের অনেক রকম কাজ।

তা ছাড়া আরো দুটো কথা আছে। প্রথমত, কৃষিকাজ শেখবার পর থেকেই মানুষের পক্ষে একটা বাঁধাধরা আস্তানা গড়ে তোলবার চেষ্টা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক : ফলমূল বা শিকারের আশায় হন্যে হয়ে ঘোরবার সময় মানুষের পক্ষে কোনো একজায়গায় থিতিয়ে বসবার কথা ওঠে না। কিন্তু চাষবাস শেখবার পর চাষের জমির আশপাশেই স্থায়ী আস্তানা গাড়তে হয়। চাষের জন্যে সব জমিই সমান উপযুক্ত নয়, যে-জমি চাষের পক্ষে ভালো মানুষের পক্ষে তারই আশপাশে পাকা আস্তানা গড়ে তোলবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক নয় কি? দ্বিতীয়ত, আগে কৃষিকাজ না আগে পশুপালন–এ নিয়ে যদিও পণ্ডিতেরা একমত নন, তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে চাষবাস করতে শেখবার পরই পশুপালনের সুযোগ অনেক বেশি। পালিত কেননা, পশুগুলোকে তো খাওয়াতে হবে। চাষবাস শেখবার পর পালিত পশুর জন্যেও খাবারের যোগান হলো, সহজ হলো পশুপালনের কাজ।

আবিষ্কারের অবকাশ আর আবিষ্কারের প্রয়োজন

কৃষিকাজ শেখবার দরুন শুধুই যে আরো কয়েক রকম কাজ শেখবার অবকাশ পাওয়া গেলো তা-ই নয়, আরো পাঁচ রকম কাজ শেখবার দরকারও পড়লো। প্রথমত, ক্ষেতের কাজটা ভালো করে করবার জন্যেই মানুষের আরো কয়েক রকম বিদ্যা ভালো করে শিখতে হলো : জমিকে উর্বরা করবার কৌশল, বর্ষার আর বন্যার সময় গোনবার কৌশল, ভালো

বীজ বাছবার আর তা সযত্নে জমিয়ে রাখবার কৌশল—এইরকম আরো অনেক কিছুই। দ্বিতীয়ত, মানুষ যে-অবকাশ পেলো আর যেসব নতুন মালমশলা হাতের কাছে পেলো তাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করবার সুযোগও জুটলো : যেমন শণ, লোম ইত্যাদি বেশি করে পাবার দরুন সুতো কাটা আর কাপড় বোনবার সুযোগ।

এইসব নানান কারণে, কৃষিকাজ আবিষ্কার হবার দরুনই মানুষের অগ্রগতি শুরু হলো আগের তুলনায় প্রায় অবিশ্বাস্য জোর গতিতে। মানুষ মন দিতে পারলো নানানরকম কাজে। সেকালের পৃথিবীতে একে আবিষ্কারের বন্যা বলা যায়।

এই যে আবিষ্কারের নতুন বন্যা এলো,—এর পিছনে আসল কারণটা কী? কৃষিকাজ শিখতে পারার ফলে মানুষ আগের তুলনায় ঢের বেশি পরিমাণ খাবার যোগাড় করতে পারছে। দুটো কথা। এক : যতোদিন খাদ্য আহরণ ততোদিন পর্যন্ত একজন মানুষ যেটুকু খাবার যোগাড় করতে পারতো তা নিশ্চয়ই সেই দিনই বা দু-একদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো। তাই বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই,—শুধু খাবারের আশায় ঘুরে বেড়ানো। এ-অবস্থায় মানুষের পক্ষে আর কোনো কাজে মন দেবার প্রশ্ন ওঠে না। দুই : খাদ্য আহরণের যুগে একজন মানুষ যতোটুকু খাবার যোগাড় করতে পারছে তা-ই দিয়ে কোনোমতে তার নিজের প্রাণ বাঁচতো। বাড়তি কিছুই পড়ে থাকতো না। ফালতু কিছুই বাকি থাকতো না। কিন্তু চাষবাস শিখতে পারবার পর খাবারের যোগানটা এতো বেশি বেড়ে গেলো যে দলের মধ্যে কতকগুলি লোককে ওই খাবার উৎপাদনের কাজ থেকে একেবারে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হলো। দলের বাকি সবাই মিলে যে-পরিমাণ ফসল ফলাবে তারই একটা অংশ দিয়ে এদের পেট চলবে আর তার বদলে এরা মন দেবে দলের বাকি সবাইকার রকমারি অভাব মেটাবার জন্যে নানারকম কারিগরি কাজে— পুরোটা মন, পুরোটা চেষ্টা, শুধু ওই কারিগরির কাজেই।

তাই কৃষিকাজ শেখবার দরুনই মানুষের দলের মধ্যে পাঁচরকম বিশেষজ্ঞ কারিগর দেখা দেওয়া সম্ভবপর হলো: কুমোর, কামার, তাঁতি, ঘরামি, আরো কতো ! শুধু তা-ই নয়; পণ্ডিতেরা দেখাচ্ছেন, এমনকি

বছরের সময় হিসেব করবার জন্য পাঁজি আর লেখার হরফও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হলো এই কৃষিকাজ আবিষ্কার হবার ফলে। লেখার হরফ আবিষ্কার থেকেই সভ্যতার শুরু।

কৃষিকাজ আবিষ্কারই যে সভ্যতার ভিত্তি ছিলো তা আমরা পুরোনো পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে বুঝতে পারবো: মিশর, মেসোপটেমিয়া, মোহেনজোদারো–প্রাচীন পৃথিবীর এই বিস্ময়কর আর অপরূপ চিহ্নগুলি নদীর কিনারায় কেন? নদীর পলি-পড়া উর্বর জমিই ছিলো কৃষিকাজের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত আর মানুষ যে ওই কেন্দ্রগুলিতে অমন অপরূপ চিহ্ন গড়ে তুলতে পেরেছিলো তার আসল কারণ হলো ওই অঞ্চলগুলিতে সোনার ফসল ফলতো–সেই ফসলই ছিলো ওইসব আশ্চর্য কীর্তির মূলে আসল সম্পদ।

কার আবিষ্কার? পুরুষদের, না মেয়েদের?

তা হলে, সভ্যতার আসল বনিয়াদ বলতে ওই কৃষি আবিষ্কারই।

কিন্তু, প্রশ্ন হলো, এ-আবিষ্কারটি করেছিলো কারা? পুরুষের না মেয়েরা? উত্তরটা শুনতে আজকের দিনে আমাদের বেশ একটু অবাক লাগে। কেননা, কৃষিকাজ আসলে পুরুষদের আবিষ্কার নয়– মেয়েদের আবিষ্কার।

শিকার করতে শেখবার আগে পর্যন্ত মানুষের দলের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি বলে কিছু ছিলো না : সকলে মিলেই একসঙ্গে বীজ, ফল আর ছোটো ছোটো জানোয়ার যোগাড় করবার জন্যে ঘুরতো। কিন্তু বল্লম তৈরি করতে শেখবার পর অন্যরকম : বল্লম হাতে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানোটা হলো পুরুষদের কাজ। মেয়েরা এই কাজে পুরুষদের সঙ্গে সমানে-সমান হয়ে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতে পারতো না। তার কারণ, মেয়েদের ওপর অন্য একটা দায়িত্ব ছিলো, সে-দায়িত্ব পালন করতে গেলে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানো চলে না। কিসের দায়িত্ব? শিশুপালন। কচিকচি দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিয়ে মেয়েরা কি বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াবে?

তা হলে, বল্লম আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষের দলের মধ্যে একরকম কাজের ভাগাভাগি দেখা গেলো : দলের পুরুষেরা বনে-জঙ্গলে বর্শা-বল্লম হাতে শিকার করে বেড়াবে আর দলের মেয়েরা আগের মতোই বস্তির আশেপাশে ফলমূল আহরণের চেষ্টা করবে।

এইভাবে ফলমূল আহরণের চেষ্টা থেকেই শেষ পর্যন্ত মেয়েরা কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিলো। ঠিক কীভাবে তারা কৃষিকাজ আবিষ্কার করলো সে-কথা অবশ্য আজকের দিনে আমাদের পক্ষে জোর করে বলবার উপায় নেয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন, বুনো ফল বীজ প্রভৃতি আহরণ করতে করতে মেয়েরা ক্রমশই দেখতে পেলো যে কোথাও কোথাও জমির ওপর বীজ পড়লে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম হয়, অঙ্কুর থেকে গাছ হয়। এই জ্ঞানটিই হয়তো কৃষি-আবিষ্কারের প্রথম ধাপ ছিলো।

মেয়েদের আবিষ্কার আর পুরুষদের আবিষ্কার সংক্রান্ত কথাগুলো খুবই জরুরি। সেসব কথা স্পষ্টভাবে না বুঝলে পুরোনো পৃথিবীর অনেক রহস্যই আমরা জানতে পারবো না। তাই এখানে কথাগুলো আরো একটু খুলে বলবার চেষ্টা করা ভালো।

কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার। আর সেই শুরুর যুগে চাষবাস ছিলো নেহাতই মেয়েলি ব্যাপার– শুধুমাত্র মেয়েরাই চাষবাস করতো, চাষবাসের সঙ্গে পুরুষদের সম্পর্ক ছিলো না। অর্থাৎ, দলের পুরুষেরা বনেজঙ্গলে শিকার করে বেড়াতো আর দলের মেয়েরা বস্তির আশপাশে মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে তার পর থেকে চিরকালই চাষবাসটা নিছক মেয়েলি কাজ, নিছক মেয়েলি ব্যাপার হয়ে রইলো। আসলে এই কৃষিকাজেরও একটা ইতিহাস আছে; চাষবাস বরাবরই একরকমের নয়। প্রথম দিকে ধারালো পাথরের নিড়েনি দিয়ে বস্তির আশপাশের ছোটোখাটো জমি কুপিয়ে ছোটোখাটো ক্ষেত রচনা করা হতো! এ-অবস্থায় চাষবাসকে ইংরেজিতে বলে গার্ডেনটিলেজ–বাংলা করে আমরা বলতে পারি বাগান-ক্ষেত রচনার কাজ।

তখনো হাল-লাঙল আবিষ্কার হয়নি। তাই হালে বলদ জুতে বড়ো বড়ো ক্ষেতে চাষ করবার ব্যবস্থাও হয়নি। অর্থাৎ বলদ দিয়ে চাষ করবার ব্যবস্থাটা অনেক পরের ব্যাপার।

হালে লাঙল জুতে বড়ো বড়ো ক্ষেতে চাষ করবার অবস্থায় মানুষ যখন পৌঁছলো তখন কিন্তু আর চাষের কাজ মেয়েদের এক্তিয়ারে রইলো না; সে-কাজ মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে এলো। তাই, কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার হলেও বরাবরই মেয়েদের কাজ হয়ে থাকেনি। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে এমনকি আজকের দিনেই এই পরিবর্তনটি চোখের ওপরে ঘটতে দেখা যায়– দেখা যায় সে-দেশের কোনো কোনো জায়গায় এতোদিন পরে মানুষ নিড়েনি দিয়ে ছোটো ক্ষেত কুপিয়ে চাষ করবার বদলে হালে বলদ জুতে বড়ো ক্ষেতে চাষ করবার ব্যবস্থা শিখছে। আর সেইসঙ্গে দেখা যায় চাষের কাজ থেকে মেয়েরা হটে যাচ্ছে, চাষের কাজ প্রধানতই পুরুষদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ক্ষেতের কাজে বলদ,–বা অন্য কোনো গৃহপালিত পশু,–ব্যবহার হবার দরুন কৃষিকাজের দায়িত্বটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে চলে আসে কেন? এ-প্রশ্নের জবাবটা বুঝতে হলে পশুপালন আবিষ্কারের কথাটা আগে বোঝা দরকার।

পশুপালন শুরু হলো কী করে? শিকার থেকে। শিকার করতে বেরিয়ে নিরীহ ধরনের পশুর বাচ্চাগুলোকে মেরে না ফেলে ঘরে ধরে এনে পোষ মানাবার চেষ্টা থেকেই পশুপালন আবিষ্কার। কথা হলো, শিকারের দায়টা কাদের ওপর ছিলো? পুরুষদের ওপরে, না, মেয়েদের ওপরে? আমরা আগেই দেখেছি, এ-দায়িত্ব মেয়েদের ছিলো না; বল্লম আবিষ্কার হবার পর থেকে শিকারের দায়িত্বটা বরাবরই পুরুষদের।

শিকার থেকেই যদি পশুপালন শুরু হয়ে থাকে তা হলে শিকার করাটা যাদের কাজ ছিলো পশুপালনও তাদেরই কাজ হবে না কি? তাই-ই। আর তাই, পশুপালন সর্বত্রই হলো পুরুষদের কাজ। আর সেইজন্যেই, চাষের কাজেও যখন থেকে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার শুরু হলো তখন থেকে চাষের কাজ আর মেয়েদের এক্তিয়ারে রইলো না। চাষের কাজও পুরুষালি ব্যাপার,–পুরুষদের কাজ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো।

তাই, কৃষিকাজ যদিও মেয়েদের আবিষ্কার, তবুও হালে লাঙল জুতে বড়ো ক্ষেতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে শেখবার সময় থেকে চাষবাসের দায়িত্ব আবার সরে গেলো মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতেই। পুরোনো পৃথিবীর রহস্য বোঝবার জন্যে এসব কথা যে কতোখানি জরুরি তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো।

ঠিক কেমন করে কৃষিকাজ আবিষ্কার হয়েছিলো তা অবশ্য আমাদের পক্ষে খুঁটিয়ে জানবার উপায় নেই। কিন্তু কৃষিকাজ যে মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো,– পুরুষেরা আবিষ্কার করেনি,–সেকথা অনুমান করবার মতো নানানরকম সূত্র আমরা পেয়েছি। কীরকম সূত্র?

এক রকম সূত্র হলো, উপকথা। উপকথা অবশ্য ইতিহাস নয়; তবে উপকথাকে ঠিকমতো বিচার করতে পারলে তার মধ্যে থেকেও কিছু-কিছু সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীতে আজও যেসব মানবদল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলিকে বিচার করতে পারলে ওই ইঙ্গিতটি খুঁজে পাওয়া যায় যে কৃষিকাজ মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো। রবার্ট ব্রিফল্ট বলে একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত এরকম অনেক উপকথা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লেখা বই থেকেই এখানে কয়েকটা নমুনা তোলা যাক।

চেরোকি বলে আমেরিকায় একদল আদিবাসী আছে। তাদের উপকথা অনুসারে বনের মধ্যে একটি মেয়েই প্রথম শস্য আবিষ্কার করেছিলো। মৃত্যুর সময় মেয়েটি নির্দেশ দিয়ে যায় যে তার মৃতদেহকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে–সে-দেহ যেখানে যেখানে মাটি স্পর্শ করলো সেখানে সেখানেই গজালো প্রভূত শস্য।

রবার্ট বিফল্ট দেখাচ্ছেন, এইরকম উপকথা পৃথিবীর শুধু একটি দেশেই প্রচলিত নয়, নানান দেশের নানান আদিবাসীর মধ্যেই প্রচলিত।

আর-এক রকম সূত্র হলো, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের বাস্তব অবস্থা। অনেক জায়গায় দেখা যায় কৃষিকাজ এখনো প্রধানতই মেয়েদের কাজ হয়ে রয়েছে– পুরুষেরা সে-কাজে অংশগ্রহণ করে না। কোথাও-বা আবার দেখা যায়, কৃষিকাজ সবেমাত্র মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে আসতে শুরু করেছে।

আর-এক রকম সূত্রহলো, আমাদের দেশে যাকে বলা হয় ব্রত। মনে রাখতে হবে, ব্রত শুধু আমাদের দেশেই নয়, আরো নানান দেশে প্রচলিত আছে। এই ব্রতগুলি খুবই আদিম যুগের ব্যাপার। নানান রকম ব্রত আছে; তার মধ্যে অনেক ব্রতই হলো শস্যের কামনায় করা। আদিম যুগের কৃষিকাজের একটা প্রধান অঙ্গই হলো শস্যের কামনায় করা এই-জাতীয় ব্রত। কিন্তু মজা এই যে, আজও আমরা দেখতে পাই শস্যের কামনায় করা এইসব ব্রতগুলি একান্তভাবেই মেয়েলি ব্রত, মেয়েদের ব্যাপার। তার থেকেই বোঝা যায় যে কৃষিকাজটাই এককালে শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যাপার ছিলো, মেয়েদেরই কাজ ছিলো।

কৃষিকাজ যে মেয়েদেরই আবিষ্কার, আর শুরুর দিকে কৃষিকাজ যে শুধুমাত্র মেয়েদেরই কাজ ছিলো,—এ-বিষয়ে আজকালকার পণ্ডিতেরা আরো নানান রকম প্রমাণ যোগাড় করেছেন। সবগুলি এখানে তোলা যাবে না। মোটের উপর এখানে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে এ-বিষয়ে আজ কালকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একমত।

কিন্তু একথার তাৎপর্য যে কী, তা অনেকেই ভেবে দেখেন না। আমরা আগেই দেখেছি যে মানুষের ইতিহাসে এই কৃষিকাজ হলো বিরাট বিস্ময়কর এক আবিষ্কার। এই আবিষ্কারটির দরুনই মানুষ সভ্যতার পথে যেন হঠাৎ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে শুরু করলো।

তা হলে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করবার কাজে সবচেয়ে বড়ো অবদানটি কাদের? পুরুষদের, না মেয়েদের? কৃষিকাজ যদি মেয়েদের আবিষ্কার হয় তা হলে নিশ্চয়ই মানতে হবে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করবার কাজেও সবচেয়ে বড়ো অবদানটি পুরুষদের নয়, মেয়েদের। একথা আজকের দিনে আমাদের পক্ষে ঠিকমতো বুঝতে পারা কঠিন। কেননা অনেক শতাব্দী ধরে আমরা এমনই এক সমাজে বাস করছি যে-সমাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের অনেক ছোটো, অনেক খাটো, অনেক দুর্বল অনেক অসহায় বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন বলে এতো বড়ো একটা চূড়ান্ত গৌরব যে পুরুষদের নয়,—মেয়েদের—সেকথা স্বীকার করতে পারা বেশ-একটু কঠিন হবার কথাই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসকে যদি ঠিকমতো বুঝতে হয় তা হলে নেহাতই একালের একটা ধারণাকে চিরকালের মতো সত্যি মনে করাও ঠিক নয়।

ঘট-তৈরি, ঘর-তৈরি, কাপড়-বোনা

আমরা আগেই দেখেছি, কৃষিকাজ আবিষ্কার হবার দরুন আদিম মানুষেরা বুনো আধা-জানোয়ারের মতো অবস্থা পিছনে ফেলে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবার যেসব পরিচয় দিতে লাগলো তার মধ্যে কয়েকটি হলো ঘট-তৈরি, ঘর-তৈরি, কাপড়-বোনা, ইত্যাদি। কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিলো মেয়েরা। কিন্তু এই যে সব নতুন নতুন আবিষ্কার– এগুলি কাদের? পুরুষদের, না মেয়েদের?

শুনতে হয়তো অবাক লাগবে; কিন্তু এসব আবিষ্কারও পুরুষদের নয়– মেয়েদেরই। আর সেইসঙ্গেই মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে আমরা এ-ধরনের আবিষ্কারকে যতোই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি না কেন, সেই পুরোনো কালের পৃথিবীতে এসব আবিষ্কারই ছিলো একেবারে যুগান্তকারী আবিষ্কার।

সমস্ত শিল্পই শুরুতে ছিলো কুটির-শিল্প আর কুটিরের সমস্ত কাজই ছিলো মেয়েদের কাজ। তাই, সমস্ত শিল্পই শুরুতে শুধু মেয়েদেরই কাজ ছিলো–মেয়েরাই এসব শিল্প আবিষ্কার করেছে, মেয়েরাই শুরুর যুগে এসব শিল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

একে একে কয়েকটা নমুনা দেখা যাক।

বসন-ভূষণ ! কাদের আবিষ্কার? মেয়েদের। প্রমাণ? আমরা "যুগের পর যুগ" গ্রন্থমালার প্রথম বইতে দেখেছি যে পৃথিবীতে সব মানুষের উন্নতিই সমান তালে হয়নি; কোথাওবা মানবদল অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছে, কোথাওবা কোনো মানবদল এগিয়ে গিয়েছে অনেকদূর পর্যন্ত। যারা এগিয়ে গিয়েছে তাদের অতীত ইতিহাসটাকে জানবার একটা উপায় হলো যারা আজও পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের দিকে চেয়ে দেখা। কেননা, ওইসব পিছিয়ে-পড়া দশা পার না হয়ে কোনো মানবদলের পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তা হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের বেলাতেও বসন-ভূষণ তৈরি করবার কাজটা কাদের ছিলো,–পুরুষদের, না, মেয়েদের,–সেকথা জানতে

পারার একটা উপায় হলো, আজকের দিনেও পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে এ-কাজের দায়িত্ব কাদের উপর রয়েছে তা চেয়ে দেখা। এইভাবে পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দিকে চেয়ে দেখলে আমরা জানতে পারি চামড়ার স্থূল জামাকাপড় তৈরি করা থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম সুতো কেটে রং-বেরঙের নকশাওয়ালা মিহি আর শৌখিন কাপড় বোনা পর্যন্ত সমস্ত কাজই শুধু মেয়েদের।

শুধু তা-ই নয়; এই শিল্পটির খাতিরে নানারকম আবিষ্কার প্রয়োজন হয়েছিলো—চামড়া ছোলবার যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সুতো কাটবার তকলি-চরকা, কাপড় বোনবার তাঁত, গাছের ছাল, আঁশ আর ফল থেকে সুতোর জন্যে মালমশলা বের করবার কৌশল, কাপড়কে রং-বেরঙে ছোপাবার জন্যে বিভিন্ন জিনিসের রাসায়নিক গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান, এমনি অনেক কিছুই। এ সমস্তই হলো মেয়েদের আবিষ্কার।

তেমনি, আজকের দিনে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দিকে চেয়ে দেখলে দেখেতে পাই কুমোরের কাজটাও সর্বত্রই মেয়েদের কাজ, যদিও পরের যুগে এই কাজ মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতেই এসে পড়েছে। পণ্ডিতেরা বলছেন, পোড়ামাটির ঘট তৈরি করবার জন্যে রকমারি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জ্ঞান দরকার। সেই আবিষ্কারগুলির গৌরবও তা হলে পুরুষদের নয়, মেয়েদেরই।

এসব কথা তবুও-বা মানা যায়। কিন্তু ঘরামির কাজ আর বাড়ি তৈরির কাজ? তাও মেয়েদেরই আবিষ্কার; শুরুর দিকে তাও ছিলো শুধুই মেয়েলি ব্যাপার। কথাটা শুনতে আমাদের কানে নিশ্চয়ই খুব খটকা লাগবে; কিন্তু আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া, আন্দামান, আমেরিকা বা মধ্য-এশিয়ার আদিবাসীদের একবার দেখে আসি তা হলে আর এ-ব্যাপারে একটুও অবাক লাগবে না।

বাড়ি তৈরির ব্যাপার নিয়ে একটা মজার গল্প বলি। কলম্বাসের অনুচরেরা তো আমেরিকায় গিয়ে পড়লো,—অনুচরদের মধ্যে কিছু-কিছু পাদরিও ছিলো। তারা দেখলো, সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে বাড়ি তৈরির যাবতীয় কাজকর্মের ভার শুধু মেয়েদের উপরই। একজন পাদরি ভাবলো, এ তো ঠিক কথা নয়; মেয়ে বেচারাদের ওপরে এতো খাটুনি

চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। পাদরি তাই একদল আদিবাসী পুরুষকে জোর করে বাড়ি তৈরি করবার কাজে লাগিয়ে দিলো। আর যাবে কোথায়? গাঁ উজাড় করে স্ত্রীলোক আর কচি ছেলেপুলের দল এসে সেখানে ভিড় জমালো। মেয়েরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যায়। পুরুষমানুষ বাড়ি তোলবার কাজে হাত লাগিয়েছে! এমন মজার ব্যাপার তারা আর জীবনে দেখেনি। ঠিক যে রকম–তুমি যদি দেখতে, পিসিমাকে হটিয়ে দিয়ে পিসেমশাই ঝোলা গোঁফ নিয়ে মাটিতে কুটনো কুটতে বসেছেন,–তা হলে তুমিও হেসে গড়াগড়ি যেতে না কি?

পুরুষ-প্রধান সমাজ আর নারী-প্রধান সমাজ

তা হলে, এতোক্ষণ ধরে যে-কথা হলো তা একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

বল্লম আবিষ্কার হবার পর থেকে আদিম মানবদলের মধ্যে একরকম কাজের ভাগাভাগি দেখা দিলো। পুরুষেরা বনেজঙ্গলে শিকার করে বেড়াতো; কিন্তু মেয়েদের ওপর শিশুপালনের দায়িত্ব ছিলো বলেই তারা অমনভাবে বনে-বাদাড়ে শিকার করে বেড়াতে পারতো না। তাই তারা বস্তির আশেপাশেই ফল, মূল, বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। এই আবিষ্কারটির দরুনই শেষ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে সভ্য হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

মিশর বলো, মেসোপটেমিয়া বলো, মহেনজোদারো বলো–পুরোনো পৃথিবীর এই যে-সব অপরূপ কীর্তি, এগুলি গড়ে তোলবার জন্যে যে-ঐশ্বর্য লেগেছিলো তা শেষ পর্যন্ত ক্ষেতের ফসল।

আর এইজন্যেই আমরা বলছিলাম, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে মেয়েরা– পুরুষেরা নয়। আমরা আরো দেখলাম, চাষবাস করতে শেখার দরুন মানুষ যে আরো কয়েকরকম আনুষঙ্গিক আবিষ্কার করলো–ঘট তৈরি, বাড়ি তৈরি ইত্যাদি–সেগুলিও মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো আর তাই শুরুর যুগে সেগুলিও প্রধানতই মেয়েলি ব্যাপার ছিলো।

অপরপক্ষে, শিকার ছিলো পুরুষদের কাজ। শিকার থেকেই পশুপালন করতে শেখা। তাই পশুপালনও পুরুষদের কাজ। আর যখন

থেকে মানুষ গৃহপালিত পশুকে লাঙলে জুতে চাষবাস করতে শুরু করেছে তখন থেকে চাষবাসের দায়িত্বটাও সরে এসেছে মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে।

এই কথাগুলি মনে রেখে এবার একটা নতুন প্রশ্ন তোলা যাক : সমাজে পুরুষেরা বড়ো, না মেয়েরা বড়ো? আজকের দিনে আমরা যে-সমাজে বাস করছি সেখানে তো দেখি, পুরুষরাই বড়ো—পুরুষরাই প্রধান। কিন্তু চিরকালই কি এইরকম ছিলো নাকি?

তা নয়। অতীতের ইতিহাসে এ নিয়ে অনেকরকম অদল-বদল হয়েছে। কীরকম অদল-বদল? প্রথমে সংক্ষেপে সেই কথাটুকু বলে নি, তারপর ব্যাখ্যা করা যাবে।

যতোদিন পর্যন্ত আদিম মানুষ শিকার করতেও শেখেনি ততোদিন পর্যন্ত দলের মধ্যে প্রধান বলতে মেয়েরাই, মা-রাই।

বল্লম আবিষ্কারের পর থেকে, বল্লম-হাতে শিকার করতে শেখবার পর থেকে, পুরুষেরাই দলের মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ালো।

কৃষিকাজের প্রথম দিকটায় কিন্তু সম্পর্ক আবার বদলে গেলো : মেয়েরা প্রধান হলো, পুরুষেরা হলো অপ্রধান।

পশুপালনের যুগটায় পুরুষরাই প্রধান, আর কৃষিকাজের পরের যুগে, —অর্থাৎ কিনা হালে বলদ জুতে বড়ো ক্ষেতে চাষ দেবার সময় থেকেই,—সমাজের প্রধান বলতে পুরুষরাই।

বারবার এরকমের অদল-বদল কেন? এবার তার ব্যাখ্যাটা দেখা যাক।

দলের মধ্যে পুরুষেরা বড়ো হবে, না মেয়েরা বড়ো হবে তা নির্ভর করেছে দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার কাদের উপর। দলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে কী বোঝায়? দলের সবাইকার জন্যে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা, কেননা খেতে না পেলে মানুষ যে বাঁচবেই না।

এখন, শিকার করতে শেখবার আগে পর্যন্ত খাবারদাবার যোগাড় করার দিক থেকে দলের মধ্যে পুরুষ আর মেয়েদের ভেতর কোনোরকম

ভাগাভাগি ছিলো না। সকলেই দল বেঁধে ফলমূল মাছ কাঁকড়া বা ছোটো জানোয়ার যোগাড় করবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরতো। তা হলে, খাবারের যোগান দেওয়ার দিক থেকে এ-অবস্থায় দলের মধ্যে পুরুষ আর মেয়ে দুই-ই সমান। তবু মেয়েদের ওপরে তা ছাড়াও একটা বাড়তি দায়িত্ব ছিলো। কিসের দায়িত্ব? শিশুপালনের। এ-দায়িত্ব যে কতোখানি তা বুঝতে পারা যাবে জানোয়ারদের সঙ্গে মানুষের একটি প্রধান তফাতের কথা মনে রাখলে। জানোয়ারের সন্তানেরা চটপট সাবালক হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের সন্তানেরা সুদীর্ঘ সময় ধরে একেবারে অসহায় হয়ে থাকে। তাই তাদের পালন করবার দায়িত্বটা মস্ত বড়ো। আর এই বাড়তি দায়িত্বের দরুনই সে-অবস্থার সমাজে মায়েরা প্রধান।

অবস্থাটার মোড় ঘুরলো শিকার শিখতে পারবার পর থেকে। কেননা তখন থেকে দলের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি দেখা দিলো। শিকারের দায়িত্বটা পুরুষদের ওপর, আর যতোদিন পর্যন্ত মানুষের কাছে ওই শিকার-করে-আনা জানোয়ারই প্রধান খাদ্য ততোদিন পর্যন্ত তাই দলের মধ্যে পুরুষরাই প্রধান।

পশুপালনও পুরুষদের কাজ। তাই, যেসব মানবদল শিকার থেকে সোজা পশুপালনের দিকে এগুলো তাদের মধ্যে পুরুষরাই প্রধান হয়ে রইলো।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষই শিকারের পর সরাসরি পশুপালনের দিকে এগোয়নি। কোনো দল-বা এগিয়েছে পশুপালনের দিকে, কোনো দল চাষবাসের দিকে। যারা পশুপালনের বদলে চাষবাসের দিকে এগুলো তাদের বেলায় কী হলো? পুরুষপ্রধান সমাজের বদলে স্বভাবতই নারীপ্রধান সমাজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ হলো নেহাতই চাষবাস শেখবার প্রথম দিককার অবস্থার কথা। কেননা, শুধুমাত্র প্রথম দিককার অবস্থাতেই চাষবাস একান্তভাবে মেয়েদের কাজ ছিলো। বলদ-জোতা হাল-লাঙলের চলন হবার পর থেকে আবার সমাজের গড়ন বদলালো—মেয়েদের বদলে পুরুষরাই হলো প্রধান।

এইখানে একটা কথা আবার বলে নি। পৃথিবীতে সব মানুষের উন্নতি একসঙ্গে সমানতালে হয়নি। তাই, এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের পাশাপাশিই

পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের অতীতটাকে জানবার ব্যাপারে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের সম্বন্ধে জ্ঞানটা খুব কাজে লাগে। কেননা, যারা আজ এগিয়ে গিয়েছে তারাও এককালে অনুন্নত দশাই পার হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলো, যে-দশায় আজকের দিনেও ওই পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষেরা আটকে রয়েছে। পিছিয়ে-পড়া অবস্থা বলতে অবশ্য সব জায়গাতেই এক রকমের নয়। মানুষ যেন এগিয়েছে ধাপেধাপে—তাই পিছনে-ফেলে-আসা অবস্থারও নানান স্তর আছে, নানান ধাপ আছে; পিছিয়ে-পড়ে-থাকা নানান মানবদল এইসব নানান ধাপের এক-একটিতে আটকে পড়ে আছে।

যদি তা-ই হয়, তা হলে চাষবাসের শুরুর দিককার সেই মা-বড়ো সমাজের অবস্থাটা যে কীরকম ছিলো তা ভালো করে জানবার একটা উপায় হলো আজকের দিনেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেসব মানবদল নানারকম পিছনে-ফেলে-আসা ধাপের মধ্যে ঠিক ওই ধাপটিতে আটকে পড়ে আছে তাদের খোঁজ করা, তাদের অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা— কেননা, এইভাবে চাষবাসের শুরুর দিককার অবস্থায় আটকে-পড়ে-থাকা মানুষদের কথা জানলে আজকের দিনের সভ্য মানুষদের পূর্বপুরুষরা এককালে ওই অবস্থায় কীভাবে জীবনযাপন করতো তা ঠাহর করা যেতে পারে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে একটা হাঙ্গামা আছে। হাঙ্গামাটা হলো, কোনো মানবদলের পক্ষেই ঠিক ওই অবস্থায় আটকে পড়ে থাকবার সম্ভাবনাটা বেশি হতে পারে না। তার মানে, শিকার শেখবার স্তরে আটকে পড়ে থাকবার সম্ভাবনা বা পশুপালনের স্তরে আটকে পড়ে থাকবার সম্ভাবনা তুলনায় অনেক বেশি; কৃষি আবিষ্কারের প্রথম দিককার স্তরে আটকা পড়ে থাকবার সম্ভাবনা তুলনায় অনেক কম।

কম কেন? কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, এই যে কৃষিকাজ—এর মতো অপরূপ আর আশ্চর্য আবিষ্কার মানুষের ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে : চাষবাস আবিষ্কার করতে পেরেছিলো বলেই মানুষের পক্ষে অসামান্য তাড়াতাড়ি একের পর এক নতুন নতুন আবিষ্কার করা সম্ভব হলো আর

তারই ভিত্তিতে মানুষ সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলতে পারলো। তাই, কৃষিকাজ আবিষ্কারের অবস্থাটা থেমে থাকবার, আটকে পড়ে যাবার, অবস্থা নয়। ঠিক তার উলটোটাই–যেন হুড়মুড় করে সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলবার জন্যে দ্বার খুলে যাবার অবস্থাই।

শিকারের উপর নির্ভর করে বাঁচবার যুগটায় সেরকম নয়; পশুপালন করে বাঁচবার যুগটায় সেরকম নয়। কেননা, ওই অবস্থাগুলিতে এগিয়ে যাবার তাগিদ তেমন বেশি নয়।

আর ঠিক এই কারণেই শিকারের পর্যায়ে আর পশুপালনের পর্যায়ে পৃথিবীর নানান মানবদল অনেক যুগ ধরে আটকে পড়ে থেকেছে; কিন্তু চাষবাসের প্রথম অবস্থার মানবদলের পরিচয় বেশির ভাগই চাপা পড়ে গিয়েছে তার উপর গড়ে-ওঠা সভ্যতার ইমারতগুলির তলায়। এ-অবস্থায় আটকা-পড়ে-থাকা মানুষদের চোখে দেখতে পাবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু পুরোনো সভ্যতার মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় যা থেকে সভ্যতার ইমারতগুলির তলায় চাপা-পড়ে-যাওয়া অনেক কথাই আন্দাজ করা সম্ভব। সেসব কথার আলোচনায় আমরা একটু পরেই ফিরবো। কিন্তু তার আগে বলা দরকার যে ওই অবস্থায় আটকে-পড়ে-থাকা মানুষদের পরিচয় কম হলেও একেবারেই যে নেই তা নয়। আমাদের দেশেরই এক প্রান্তে মোটামুটি এ-অবস্থায় আটকে-থাকা মানুষদের নমুনা রয়েছে।

কামাখ্যার মেয়েরা জাদু জানে?

আমরা ছোটোবেলা থেকেই শুনেছি, কামরূপ কামাখ্যার দিকে মেয়েরা জাদু জানতো। তারা নাকি পুরুষদের ভেড়া করে দিতো। এসব কথা সত্যি নাকি? সত্যি বইকি ! কিন্তু সত্যি মানে? পুরুষদের ভেড়া করে দেয় মানে? সত্যিই কি মেয়েদের জাদুমন্ত্রের জোরে পুরুষদের লোম গজাতো, লেজ গজাতো ? তা নয়। তবুও ভেড়া করে রাখবার কথাটা মিথ্যে নয়। আসলে, এ হলো মা-বড়ো বা নারীপ্রাধান সমাজের একটা চলতি বর্ণনা; যে-অবস্থায় মেয়েরা বড়ো আর পুরুষেরা মেয়েদের অধীন সে-অবস্থাকে

বোঝাবার জন্যে দেশের লোক ওইরকম ভেড়া-করে-রাখবার প্রবাদ রচনা করেছিলো।

এই মা-বড়ো বা নারীপ্রধান সমাজের কথা শুনতে আমাদের আজকাল হয়তো খুবই অদ্ভুত লাগে। তার কারণ, আমরা একেবারে অন্যরকম সমাজে জীবনধারণ করি। কিন্তু তবুও আমাদের পক্ষে আজ ওইরকম মা-বড়ো সমাজ স্বচক্ষে দেখে আসা সম্ভব। কোথায়? কামাখ্যার অঞ্চল পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব মুখে আরো খানিক দূর এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে গারো পাহাড় আর সেখানের খাসিয়াদের মধ্যেই আজও মা-বড়ো সমাজের রূপটা রীতিমতো স্পষ্টভাবে টিকে আছে।

খাসিয়াদের সমাজের কথা কিছুটা বলবো। কিন্তু তর আগে আর-একটা কথা মনে রাখা দরকার : খাসিয়াদের কাছে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন বলতে চাষের কাজ। কিন্তু এ-অঞ্চলের বেশির ভাগ জায়গাতেই এখনো হাল-বলদের চল হয়নি। অর্থাৎ কিনা, এই জাতির মানুষেরা এখনো মোটের ওপর চাষবাসের প্রথম দিককার অবস্থাতেই আটকে রয়েছে। কেন আটকে রয়েছে–এর বেশি কেন এগুতো পারেনি–সেকথা অবশ্য আলাদা। এখানে আমাদের পক্ষে সে-প্রশ্নের আলোচনা তোলা সম্ভব হবে না। তার বদলে আমরা ওই খাসিয়াদের দৃষ্টান্ত থেকে বিশেষ করে যে কথাটি বোঝবার চেষ্টা করবো তা হলো এই যে, কৃষিকাজের ওইরকম একটা শুরুর দিকের পর্যায়ে আটকে থেকেছে বলেই ওদের মধ্য থেকে মা-বড়ো বা নারীপ্রধান সমাজের রূপটি আজও লুপ্ত হয়নি। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার। তাই কৃষিকাজের আদিপর্বে যে-সমাজ তাতে মেয়েদের উপর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। এ-সমাজ তাই মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান।

আমাদের আজকালকার সমাজের সঙ্গে খাসিয়াদের সমাজের তফাতগুলো ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের বেলায় পরিবারের মধ্যে প্রধান বলতে কে? বাবা, বা ঠাকুরদা, বা ওইরকমের কেউ–যিনি কিনা একজন পুরুষমানুষ, কর্তামশাই। পরিবারের সকলেই তাঁর আদেশ মেনে চলেন–তাঁর আদেশ মেনে চলতে সকলেই বাধ্য। কিন্তু খাসিয়াদের বেলায় উলটো রকম। পরিবারের প্রধান বলতে মা–মা-

র আদেশটাই সকলের কাছে চূড়ান্ত। এক কথায়, কর্তৃত্বটা পুরুষদের নয়, মেয়েদের।

শুধু তা-ই নয়; কোনো কোনো এলাকায় এমনকি দেখা যায় যে সম্পত্তি বলতে যা-কিছু তার উপর পুরুষদের কোনো অধিকারই নেই–অধিকার শুধুমাত্র মেয়েদেরই। আমাদের সমাজে যেরকম তার ঠিক উলটো নয় কি? আমাদের বেলায় বাপের সম্পত্তি ছেলেরা পায়, খাসিয়াদের বেলায় মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পায়,–অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকার চলে মায়ের সূত্রেই।

আমাদের বেলায় বাপের পরিচয়েই ছেলের পরিচয়, ছেলেরা বাপের গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়। মেয়েরাও বিয়ের পর স্বামীর গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়। যেমন ধরো, ঘোষ-বাড়ির ছেলের সঙ্গে বোস-বাড়ির মেয়ের বিয়ে হলো, বিয়ের পর বোস-বাড়ির মেয়ে আর বোস রইলো না। তারপর, তাদের যে-সব ছেলেপুলে হলো তারা ঘোষ হবে, না বোস হবে? নিশ্চয়ই ঘোষ হবে। আমাদের সমাজে বাপের গোত্র হিসেবেই ছেলের গোত্র। খাসিয়াদের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উলটো ব্যবস্থা; বাবার পরিচয়ে ছেলেমেয়েদের পরিচয় নয়, বাবার গোত্রর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের গোত্রর কোনো সম্পর্কনেই–ছেলেমেয়েরা বাবার গোষ্ঠীর কেউ নয়। তা হলে তারা কোন গোষ্ঠীর মানুষ? কার পরিচয়ে তাদের পরিচয়? মায়ের। মা-র বংশপরিচয়েই সবাইকার বংশ-পরিচয়। মা-র দিকের আত্মীয়স্বজনেরাই তাদের সবচেয়ে নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠী। তাদের কাছে বাবা অনেকটাই যেন বাইরের মানুষ, বাবার আত্মীয়স্বজনেরা তাদের কাছে প্রায় অনাত্মীয় মানুষদের মতোই।

অবস্থা কীরকম তা একবার ভেবে দ্যাখো। ছেলেমেয়েরা তাদের মা-র বংশের মানুষ; কিন্তু তাদের বাবা কোন বংশের মানুষ? বাবার মা, অর্থাৎ ঠাকুরমার বংশের মানুষ। ঠাকুরমার বংশের মানুষ মানে কিন্তু ঠাকুরদার বংশের মানুষ নয়; কেননা ঠাকুরদার বংশ আবার অন্য ঠাকুরদার-মা-র বংশ। আমাদের কাছে ব্যাপারটা কীরকম গোলমেলে লাগবে তা দেখবার জন্যে আমরা মাতৃপ্রধান সমাজের বংশ-পরিচয়ের একটা নকশা শুরুর দিকেই এঁকে দিয়েছি। আর তার পাশেই এঁকে

দিয়েছি পিতৃপ্রধান আধুনিক সমাজের বংশপরিচয়ের আর-একটা নকশা। দুটোকে মিলিয়ে দেখলে তফাতটা যে কতোখানি আকাশপাতাল তা বোঝবার সুবিধে হবে।

একটা কথা। বংশপরিচয়ের এই নকশায় একেবারে আদি-অকৃত্রিম মাতৃপ্রধান সমাজের ব্যবস্থাটাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে বংশপরিচয় ব্যবস্থাটা হুবহু এইরকমের ছাঁচে ঢালা নয়। সামান্য কিছু-কিছু রদবদল হয়েছে। তার মানে, খাসিয়াদের মধ্যে মোটের ওপর মাতৃপ্রধান সমাজের কাঠামোটা টিঁকে থাকলেও আজকের দিনে তাতে কিছু-কিছু ভাঙন ধরতে দেখা যায়। একটু পরেই এই ভাঙনের চিহ্নগুলির কথা তুলবো। তার আগে দেখা যাক, মাতৃপ্রধান সমাজের আরো কতোরকম পরিচয় খাসিয়াদের মধ্যে আজও টিঁকে আছে।

মায়ের সূত্রে মানুষের বংশপরিচয়, বাবার সূত্রে নয়। আর এইজন্যেই আমরা যে-রকম বংশের আদিপুরুষের কথা বলি খাসিয়ারা তেমনি বংশের আদিমাতা বা আদিনারীর কথা বলে। ওদের মধ্যে প্রবাদ আছে মেয়েদের থেকেই মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি।

মানুষ মারা যাবার পর তাকে কবর দেবার যে-ব্যবস্থা তার মধ্যেও এই মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয়টা স্পষ্ট। ধরো, 'ক'-বলে এক খাসিয়া-বুড়ো মারা গেলো। কোন কবরখানায় তাকে গোর দেওয়া হবে? যেখানে তার বাবাকে গোর দেওয়া হয়েছিলো? উঁহুঁ। তা নয়। তার বদলে যেখানে তার মা-কে গোর দেওয়া হয়েছিলো সেখানেই তাকেও কবর দেওয়া হবে। কেননা, 'ক'-বুড়ো তো আর তার বাবার বংশের লোক নয়, মায়ের বংশের লোক। তাই, মা-মাসি-দিদিমা-মামা-বোন-ভাগ্নেদের কবরখানাটাই তারও কবরখানা। তেমনিই আবার, তার বাবা-জ্যেঠা-খুড়ো-পিসি সবাই হলো 'ক'-বুড়োর ঠাকুরমার বংশের লোক। সেটা আলাদা বংশ বলেই ওদের সবাইকার জন্যে আলাদা একটা কবরখানা।

তা হলে, 'ক'-বুড়োর ছেলে মরলে তাকে কোন কবরখানায় কবর দেওয়া হবে? যেখানে 'ক'-বুড়োকে কবর দেওয়া হয়েছে? উঁহুঁ! যেখানে 'ক'-বুড়োর বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছে? তাও নয়। তা হলে? যেখানে 'ক'-বুড়োর বৌ-কে কবর দেওয়া হয়েছে সেইখানে। সেটা আলাদা

কবরখানা। কেননা, 'ক'-বুড়োর-বৌ 'ক'-বুড়ি হলো আলাদা বংশের মানুষ, আর ওই 'ক'-বুড়ির ছেলেমেয়েরাও হলো 'ক'-বুড়ির বংশেরই মানুষ।

আরো একটা কথা আছে। একই কবরখানায় এক বংশের পুরুষ আর মেয়েদের কবর দেবার ব্যবস্থা হলেও মেয়েদের কবরগুলো সামনের দিকে, পুরুষদের কবরগুলো পিছনের দিকে। এমন কেন? কেননা পুরুষেরা তো আর বড়ো নয়। মেয়েরাই বড়ো। মেয়েরাই প্রধান। মরবার আগে যে-রকম, মরবার পরেও সেইরকম পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সম্মান ঢের বেশি।

খাসিয়াদের মধ্যে দেবদেবী নিয়ে যেসব কল্পনা তার বেলাতেও একই কথা। অর্থাৎ কিনা, ওদের ধর্মে দেবীরাই দলে বেশি আর মর্যাদার দিক থেকেও দেবতাদের চেয়ে অনেক বড়ো। একটুখানি ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, এমনটা না-হয়েও উপায় নেই। খাসিয়াদের ধর্মে দেবদেবী নিয়ে যে-কল্পনা তা তো খাসিয়াদের মাথা থেকেই বেরিয়েছে—এমন তো আর নয় যে ভিন্ন দেশের ভিন্নরকম সমাজের লোকেরা গিয়ে খাসিয়াদের মনে কয়েকটি দেবদেবীর কল্পনা গেঁথে দিয়ে এসেছে। এখন, কথা হলো, খাসিয়াদের নিজস্ব কল্পনা কিসের উপর নির্ভর করবে? খাসিয়াদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর। কেননা, মানুষ যা দেখেনি, অভিজ্ঞতায় যার পরিচয় পায়নি, তা নিয়ে কল্পনাও করতে পারে না।

একথা অবশ্য ঠিক যে কল্পনা করবার সময় মানুষ অভিজ্ঞতায় যা জেনেছে তাকে নানানভাবে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ভাবতে থাকে। কিন্তু তা হলেও তার ভাবনার কাঠামোটা বাঁধা থাকে তার অভিজ্ঞতা দিয়েই। আমরা ঘোড়া দেখেছি, পাখি দেখেছি; দুই অভিজ্ঞতা মিলিয়ে পক্ষিরাজের কথা কল্পনা করতে পারি। যে-লোক ঘোড়াও দেখেনি পাখিও দেখেনি, তার পক্ষে পক্ষিরাজের কথা কল্পনা করাই সম্ভব নয়। আমরা সোনা দেখেছি, পাহাড় দেখেছি; আমরা তাই সোনার পাহাড়ের কথা কল্পনা করতে পারি। যে-লোক সোনাও দেখেনি পাহাড়ও দেখেনি, সে কখনো সোনার পাহাড়ের কথা কল্পনাও করতে পারবে না।

খাসিয়ারা দেবদেবীর যে-সমাজটার কথা কল্পনা করেছে তারও মালমশলা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা। কিসের অভিজ্ঞতা? নিজেদের সমাজের অভিজ্ঞতা। সে-সমাজ কেমন ধরনের? মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান সমাজ। খাসিয়াদের কল্পনায় এই অভিজ্ঞতা তাই যে-দেবলোকের সৃষ্টি করলো সেখানেও পুরুষেরা ছোটো, মেয়েরা বড়ো—দেবতারা ছোটো, দেবীরা বড়ো।

দেবদেবীর কথাটা জরুরি, কেননা এই দেবদেবীর কল্পনার মধ্যে অনেক সময় অতীত ইতিহাসের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তাই কোথাও যদি দেখা যায় দেবলোকের কল্পনায় দেবীরা খুব গৌরবের আসন দখল করে রয়েছে তা হলে আন্দাজ করতে হবে যে এককালে সেখানে মাতৃপ্রধান সমাজই ছিলো, সেই মাতৃপ্রধান সমাজ থেকেই জন্ম হয়েছিলো ওই দেবীদের কল্পনা। পরে হয়তো সমাজ বদলেছে, কিন্তু দেবদেবীদের কথা ঠিক সেই তালে বদলায়নি। আসলে, দেবদেবীর কল্পনা বদলাতে অনেক বেশি সময় লাগে।

খাসিয়াদের কথায় আবার ফেরা যাক। শুধুই যে তাদের ধর্মে দেবীদের প্রাধান্য তা-ই নয়—ও-অঞ্চলের অনেক জায়গায় আজও দেখা যায় এলাকার শাসনক্ষমতাটাও পুরুষদের হাতে নয়, মেয়েদের হাতে। তার মানে, সে-সব অঞ্চলের শাসক বলতে রাজা নয়, রানি। রাজা যেন রানির পাশে গোলামটির মতো— সমস্ত ক্ষমতাটাই রানির, রাজার ক্ষমতা নেই। আবার, রানির মেয়েই রানি হবে; রাজপুত্র রাজ্য পাবে না।

এও হলো মাতৃপ্রধান সমাজের আর-একটি লক্ষণ। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, খাসিয়াদের মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের কাঠামোটা অনেক অংশে টিঁকে থাকলেও ও-অঞ্চলের সর্বত্রই যে তা পুরোপুরি বা অক্ষুণ্নভাবে টিঁকে রয়েছে, এমন কথা মনে করা ভুল হবে। খাসিয়াদের মধ্যে কোথাও কোথাও মাতৃপ্রধান সমাজের চিহ্ন অনেক বেশি স্পষ্ট; কোথাও কোথাও সে-সমাজে ভাঙন ধরার কিছু-কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তাই, ওদের দেশে কোনো কোনো অঞ্চলে যদিও আজ পুরোপুরি রানির শাসনই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও সব অঞ্চলেই হুবহু তা নয়। আজকের দিনে কোথাও কোথাও শাসনকাজে মেয়েদের ক্ষমতা কমেছে,

পুরুষদের ক্ষমতা ফুটে উঠছে। এগুলিকে মাতৃপ্রধান সমাজের ভাঙনের দৃষ্টান্ত বলে চিনতে হবে।

খাসিয়াদের মধ্যে পুজোপাটের ব্যবস্থাটা কী রকম? অনেক জায়গায় দেখা যায়, পুজোপাটের দায়িত্ব পুরুষেরই ওপর। অর্থাৎ, পুরোহিত বলতে পুরুষই। কিন্তু সেইসঙ্গেই একটা ভারি মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। ধর্মকর্মের ভারটা যদিও পুরুষদের ওপরই, তবুও এই পুরুষেরা নিজে-নিজেই ধর্মকর্মের সবটুকু দায়িত্ব নিতে পারে না। পুরুষ-পুরুত যখন কাজকর্ম করবে তখন তার পাশে বসে থাকবে এক মেয়ে-পুরুতও। এই মেয়ে-পুরুতটির উপস্থিতি ছাড়া পুরুষ-পুরুতের আসল ক্ষমতা থাকে না। তার থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে এককালে এ-ক্ষমতাও মেয়েদেরই একচেটিয়া ক্ষমতা ছিলো; সে-ব্যবস্থার ভাঙন ধরে আজকের দিনে পুরুষদের হাতেই ধর্মকর্মের ক্ষমতাটা চলে আসছে, কিন্তু এখনো তা সম্পূর্ণভাবে এসে পড়েনি। তাই কাজকর্মের সময় কোনো-না-কোনো মেয়ে-পুরুতকে সামনে বসিয়ে তবে তারা কাজকর্ম করতে পারে।

ছেলের বদলে ভাগনে

খাসিয়াদের মধ্যে,—এবং সারা পৃথিবীতে বোধহয় এই খাসিয়াদের মধ্যেই, মাতৃপ্রধান সমাজের কাঠামোটা আজও মোটামুটি টিকে রয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, ওদের অবস্থাও সর্বত্র সমান নয়। ওদের মধ্যেও কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায় মাতৃপ্রধান এই কাঠামোটিতে ভাঙন ধরেছে। তাই, মাতৃপ্রধান সমাজে যখন সবে ভাঙন ধরতে শুরু করে তখনকার অবস্থায় কীরকম অদলবদল দেখা দেয় তারও খানিকটা পরিচয় আমরা এই খাসিয়াদের কাছ থেকেই জানতে পারবো।

বংশপরিচয়ের কথা আর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথা দেখা যাক।

আদি-অকৃত্রিম মাতৃপ্রধান সমাজে কীরকম? মায়ের সম্পত্তি মেয়ে পাবে—সম্পত্তিতে বাবারও কোনো অধিকার নেই, ছেলেরও কোনো অধিকার নেই। এই ব্যবস্থা বদলে পিতৃপ্রধান সমাজে একেবারে উলটো ব্যবস্থা হয়ে গেলো। বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবে; সম্পত্তিতে মায়েরও

কোনো অধিকার নেই, মেয়েরও কোনো অধিকার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই যে অদলবদল—এ কি সরাসরি একলাফে হয়েছিলো? তা নয়। আসলে, মাতৃপ্রধান সমাজ ভাঙতে ভাঙতে পিতৃপ্রধান সমাজের রূপটি ফুটে ওঠবার মাঝখানে আরো দুটি স্তর আছে।

এই দুটি স্তরের মধ্যে একটির পরিচয় পাওয়া যায় খাসিয়াদের মধ্যেই, আর-একটির পরিচয় পাওয়া যায় রোমান রাজরাজড়াদের ইতিহাস থেকে। রোমান রাজরাজড়াদের কথা পরে তুলবো। আগে খাসিয়াদের কথাটা সেরে নি।

খাসিয়াদের মধ্যে কোথাও কোথাও মাতৃপ্রধান সমাজের আদি-অকৃত্রিম রূপটি আজও টিঁকে আছে। সেখানে সম্পত্তি সরাসরি মা থেকে মেয়ের দিকেই যায়। আবার কোথাও কোথাও মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। সেখানে কীরকম? মামার সম্পত্তি ভাগনে পাবে। তার মানে, 'ক'-বুড়ো মরলে তার সম্পত্তি তার ছেলে পাবে না, তার বদলে পাবে তার ভাগনে। তা হলে, 'ক'-বুড়োর ছেলেরা কী পাবে? তারা তাদের মামার সম্পত্তি পাবে— আর ঠিক সেই কারণেই তাদের মামার ওই সম্পত্তিতে তাদের মামাতো ভাইদের কোনো অধিকার থাকবে না! ব্যবস্থাটা যে ঠিক কীরকম তার নকশাও শুরুর দিকে এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ আবার কোন ধরনের ব্যবস্থা? এরকম ব্যবস্থা কেন?

এ-ব্যবস্থা এমনিতে আমাদের কাছে যতোই কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হোক-না কেন, ভালো করে ভাবলে আমরা বুঝতে পারবো মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে ওঠবার মাঝামাঝি অবস্থায় এরকম একটা ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক।

এই ব্যবস্থায় সম্পত্তি অবশ্য পাচ্ছে পুরুষরাই—সেদিক থেকে মাতৃপ্রধান সমাজ বদলে যাবারই পরিচয়। কিন্তু এর মধ্যে মাতৃপ্রধান ব্যবস্থার স্মৃতিটা কোথায়? কেননা, এ-ব্যবস্থায় পুরুষেরা সরাসরি সম্পত্তি পাচ্ছে না—সম্পত্তি পুরুষানুসূত্রে যাচ্ছে না। সম্পত্তি যাচ্ছে মেয়েদের সূত্র ধরেই। মাতৃপ্রধান সমাজে মামা আর মা একই বংশের লোক, কিন্তু মামার ছেলেরা আর সে-বংশের মানুষ নয়। কেননা, মামা বিয়ে করেছে

অন্য বংশের মেয়েকে আর মাতৃপ্রধান ব্যবস্থা বলেই তার যে-ছেলেপুলেরা হবে তারা ওই অন্য বংশের হয়ে যাবে। মামার ছেলেরা মামির বংশের লোক, মামার বংশের লোক নয়। তাই, মাতৃপ্রধান সমাজের আইনকানুনের দিক থেকে মামার সম্পত্তি মামার ছেলেরা পেতে পারে না; কেননা তা হলে এ-বংশের সম্পত্তি ও-বংশের লোকের হাতে চলে যাবে। তা হলে সম্পত্তিটা পাবে কে? ভাগনে। কেন? তার কারণ ভাগনে হলো মামার বংশেরই মানুষ, মাতৃপ্রধান সমাজের দিক থেকে এই ভাগনের বংশ তার মার বংশ অনুসারেই হবে–অর্থাৎ তার মামার বাড়ির বংশই।

তা হলে, মামার কাছ থেকে ভাগনের পক্ষে সম্পত্তি পাবার ওই ব্যবস্থাটিতে একদিকে মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে–পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজ বজায় থাকলে মায়ের সম্পত্তি সরাসরি মেয়েরাই পেতো, সম্পত্তিতে পুরুষদের কোনো অধিকারই থাকতো না। আবার অপরদিকে এই ব্যবস্থাটির মধ্যেই মাতৃপ্রধান সমাজের রেশ টিঁকে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার কারণ, সম্পত্তিতে পুরুষদের অধিকার দেখা দিলেও সম্পত্তি মায়ের বংশের বাইরে যাচ্ছে না–মায়ের সূত্রেই, বা মেয়েদের সূত্রেই, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বলছিলাম, মামার কাছ থেকে ভাগনের পক্ষে সম্পত্তি পাবার ব্যবস্থাটিতে মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে ওঠবার মাঝামাঝি কোনো অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরকম উত্তরাধিকার ব্যবস্থা শুধুই যে খাসিয়াদের মধ্যে কোথাও কোথাও চোখে পড়ে তা নয়। ইরোকোয়া বলে আমেরিকার একজাতের আদিবাসীদের মধ্যেও ঠিক এইরকম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থাটাই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক এইরকম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো পুরোনো পুঁথিপত্রে। আমাদের দেশেরই পুরোনো পুঁথি থেকে এখানে একটা নমুনা তোলা যাক। মহাভারতের এক জায়গায় আরট্ট-দেশবাসী বাহিক নামের একজাতের মানুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আর বলা হয়েছে যে এদের মধ্যে পুত্রেরা সম্পত্তির অধিকারী নয়, তার বদলে সম্পত্তির অধিকারী হলো ভাগনেরা। ব্যাপারটা ঠিক কী, এরকম ব্যবস্থা কেন,–এই প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকদিন পর্যন্ত খুবই ধাঁধায়

পড়েছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে পুরোনো কাল সম্বন্ধে অনেক ভালো জ্ঞান পেয়ে আমাদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই ব্যবস্থাটির মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পড়বার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পুরোপুরি পিতৃপ্রধান সমাজ তখনো গড়ে ওঠেনি।

ছেলের বদলে জামাই

আগেই বলেছি, মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে ওঠবার পথে এর পর যেরকম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা চালু হলো তার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের রোমান রাজরাজড়াদের ইতিহাসে। কীরকম ব্যবস্থা? ব্যবস্থাটা হলো, শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই পাবে।

প্রথমে এই ব্যবস্থাটার কথা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজে কীরকম? মায়ের সম্পত্তি মেয়ে পাবে। তাই, সে-ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে পুরুষদের কোনো অধিকারই নেই। কিন্তু রোমান রাজরাজড়াদের বেলায় দেখা যাচ্ছে, শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই পাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা সম্পত্তিটা থাকছে পুরুষদের হাতেই। ব্যবস্থাটাকে তাই মাতৃপ্রধান সমাজের লক্ষণ বলা চলে না।

কিন্তু মজা এই যে, রোমানদের ওই ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পিতৃপ্রধান সমাজের ব্যবস্থাও বলা চলে না। কেননা, পুরোপুরি পিতৃপ্রধান সমাজে তো বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবে। অথচ রোমানদের বেলায় দেখা যাচ্ছে 'ক'-রাজার সম্পত্তি 'ক'-রাজার ছেলে পেলো না–তার বদলে 'ক'-রাজার জামাই পেলো।

আমরা বলছি, এইভাবে ছেলের বদলে জামাইয়ের পক্ষে সম্পত্তি পাবার ব্যবস্থায় মাতৃপ্রধান সমাজের একটা রেশ পাওয়া যায়। তাই ব্যবস্থাটাকে মাতৃপ্রধান সমাজ ছেড়ে পিতৃপ্রধান সমাজের দিকে এগুবার মাঝপথের কোনো ব্যবস্থা বলে বুঝতে হবে।

মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজ–মেয়েদের হাত থেকে সম্পত্তি আসবে পুরুষদের হাতে। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে খাসিয়া প্রভৃতির মধ্যে দেখা গেলো সম্পত্তিটা এসেছে মেয়ের ভাইয়ের

হাতে–তার কাছ থেকে সেই মেয়ের ছেলে সম্পত্তি পাবে। মামার কাছ থেকে ভাগনের কাছে। এ-অবস্থাতেও কিন্তু মেয়ের স্বামীর কোনো অধিকার নেই–সে বাইরের লোক, অন্য বংশের লোক। দ্বিতীয় ধাপে–যেমন রোমান রাজাদের বেলায়–দেখা যাচ্ছে সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকার ফুটে উঠছে : রানিকে বিয়ে করে রাজা রাজত্ব পাচ্ছে, তাদের মেয়েকে বিয়ে করে আবার তাদের জামাই রাজত্ব পাচ্ছে। তাই এ-অবস্থাতেও সম্পত্তিটা মেয়েদের সূত্রেই চলেছে– রাজারানির মেয়েকে যে বিয়ে করবে সে-ই পাবে রাজারানির সম্পত্তি। তবুও সম্পত্তি মেয়েদের হাতে থাকছে না–মেয়েদের স্বামীদের হাতে চলে যাচ্ছে।

রোমান রাজরাজড়াদের মধ্যে উত্তরাধিকারের এই ব্যবস্থাটায় যদি মাতৃপ্রধান সমাজেরই রেশ খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে কী প্রমাণ হবে? যদি বোঝা যায় যে এ হলো মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরবারই আরো পরের কোনো লক্ষণ? প্রমাণ হবে যে ওরা যাদের বংশধর তারা নিশ্চয়ই এর আগে পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজেই বাস করতো। কেননা আগে যদি মাতৃপ্রধান সমাজ না থাকে তা হলে পরে মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরবার লক্ষণও থাকতে পারে না।

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র আর মাতৃপ্রধান সমাজের নানান চিহ্ন

রোমানদের সমাজও এককালে মাতৃপ্রধান সমাজই ছিলো–একথা শুনতে আজকের দিনে আমাদের খানিকটা অবাকই লাগে। কিন্তু শুরুতে যে-কথাগুলো বলেছি সেগুলো, যদি একবার ঝালিয়ে নেওয়া যায় তা হলে আর এই কথাটি শুনে এমন কিছু অবাক লাগবে না।

আমরা শুরুতে দেখেছি, অনেক লক্ষ বছর ধরে আধা-জানোয়ারের মতোই অসহায় অবস্থায় দিন কাটাবার পর মানুষ চাষবাস করতে শিখলো, আর এই চাষবাস করতে শেখার দরুনই মানুষ হঠাৎ যেন হুড়হুড় করে এগুতে শুরু করলো–মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই গড়ে তুললো প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলি।

চাষবাস আবিষ্কার তাই মানুষের ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার, এই আবিষ্কারটি থেকেই প্রাচীন মানুষেরা সভ্যতার দিকে এগুবার পথ চিনতে শিখলো।

আমরা আরো দেখেছি, চাষবাস পুরুষেরা আবিষ্কার করেনি; তার বদলে চাষবাস আবিষ্কার করেছিলো মেয়েরাই–যদিও অবশ্য পরের যুগে,–হাল-বলদের চলন হওয়ার পর থেকে,–চাষের দায়িত্ব মেয়েদের বদলে পুরুষদের হাতেই চলে এলো। কিন্তু সেসব অনেক পরের যুগের ব্যাপার।

চাষবাসের দায়িত্ব যতোদিন পর্যন্ত পুরুষদের হাতে যায়নি,–মেয়েদের হাতেই থেকেছিলো,–ততোদিন পর্যন্ত সমাজের গড়নটা কীরকম? মেয়েরাই বড়ো, মায়েরাই বড়ো। সে-সমাজের নাম তাই মা-বড়ো বা মাতৃপ্রধান সমাজ। মেয়ে-বড়ো বা নারীপ্রধান সমাজও তাকে বলতে পারো।

যদি কৃষিকাজ আবিষ্কারের দরুনই সভ্যতা সম্ভব হয়ে থাকে আর এই কৃষিকাজ আবিষ্কারের যুগটায় সমাজ যদি মাতৃপ্রধানই হয়ে থাকে,–তা হলে পৃথিবীতে যেগুলি কিনা প্রাচীন সভ্যতার–প্রথম সভ্যতার–ঘাঁটি সেগুলির তলায় মাতৃপ্রধান সমাজের ইতিহাসই চাপা পড়ে থাকবার কথা নয় কি?

তাই, শুধু রোমানদের কথাই নয়। রেমানদের চেয়েও ঢের ঢের আগেই যারা পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে তুলতে শুরু করেছিলো তাদের আস্তানাগুলি খোঁজ করলে আমরা মাতৃপ্রধান সমাজের নানানরকম টুকরো-টাকরা চিহ্ন খুঁজে পাবো। তা ছাড়া, আরো একটা কথা আমরা বারবার করে বলতে চেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষের উন্নতিই একসঙ্গে সমানতালে হয়নি। কোথাও কোথাও মানুষ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে, কোথাও কোথাও আবার পড়ে রয়েছে অনেকখানি পিছনে। তাই এই পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের অবস্থাটাও যদি ভালো করে পরীক্ষা করা যায় তা হলে তাদের মধ্যেও ওই মা-বড়ো সমাজের কিছু-কিছু পরিচয় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না।

তা হলে এসো। পৃথিবীকে তল্লাশ করে দেখা যাক–তল্লাশ করে দেখা যাক এইভাবে প্রাচীন সভ্যতার ঘাঁটিগুলো, তল্লাশ করা যাক পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের বিধি-ব্যবস্থাগুলো, আর দেখা যাক এইভাবে সেই যুগটির কতোখানি পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারি, যে-

যুগে মেয়েরা বড়ো, মায়েরা বড়ো। কিন্তু তল্লাশ শুরু করবার আগে একটা কথা মনে করিয়ে দি : খাসিয়াদের অবস্থাটা আলোচনা করে আমরা একটু আগেই যা শিখলাম তা এবার আমাদের খুব কাজে লাগবে। কেননা, আজকের দিনে এই খাসিয়াদের মধ্যেই মা-বড়ো সমাজের বেশি লক্ষণ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে টিকে রয়েছে; তাই অন্যান্য জায়গায় ওই মা-বড়ো সমাজের টুকরো-টাকরা চিহ্নগুলি খোঁজ করবার সময়ে খাসিয়াদের দেখে শেখা মা-বড়ো সমাজের লক্ষণগুলির কথা মনে রেখে এগুলেই আমাদের সুবিধে হবে।

চীন, তিব্বত আর সুদূর প্রাচ্য

চীন থেকে শুরু করা যাক। খুব সম্প্রতিকাল পর্যন্ত চীন দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এমন কয়েকটি জাতির বাস ছিলো যাদের মধ্যে শাসনের ক্ষমতা ছিলো পুরুষদের হাতে নয়, মেয়েদের হাতে। এহেন একটি জাতির নাম সু-মু–সংখ্যায় তারা প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ। তাদের মধ্যে শাসন-ব্যাপারে সবচেয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা তাদের রানির হাতে। আর-একটি জাতির নাম নুয়ে-কুন্–তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা : রানির বংশের মেয়েরাই রানি হবে। তার মানে, এইসব জাতির মধ্যে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ওই মা-বড়ো যুগটি বেশ স্পষ্টভাবেই টিকে থেকেছে।

এই তো গেলো আধুনিক যুগের কথা। প্রাচীন যুগে কীরকম? গ্রানেট বলে পণ্ডিত বলছেন, প্রাচীন যুগে চীনদেশে পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজ ছিলো– মায়ের বংশ অনুসারেই ছিলো সন্তানদের বংশপরিচয়। আর স্বামীদের অবস্থা? আমরা যেরকম কামরূপ-কামাখ্যায় পুরুষদের ভেড়া করে রাখবার গল্প শুনেছি অনেকটা সেইরকমই। ঘর-সংসার থেকে শুরু করে দেশ-শাসন পর্যন্ত–সর্বত্রই মেয়েদের প্রতিপত্তি। স্বামীদের অবস্থা গোলামটির মতো।

চীন থেকে তিব্বতের দিকে এগুনো যাক। সেকালে তিব্বতের উত্তর অঞ্চলকে চীনেরা কী নাম দিয়েছিলো জানো? নু-কুয়ো। ওদের ভাষায় এই নামটির মানে হলো 'মেয়েদের রাজ্য'। নুই-সু আর তাং-সু নামে

সেকালের দুজন চীনা পরিব্রাজক তিব্বতের এই উত্তর অঞ্চলটির কীরকম বর্ণনা দিচ্ছেন দ্যাখো।

এই নু-কুয়ো বা 'মেয়েদের রাজ্য'-টি কতো বড়ো? তার পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত নয় দিনের পথ, উত্তর থেকে দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বিশ দিনের পথ। সে রাজ্যে ৮০টি নগর, ৪০,০০০ পরিবারের বাস, ১০০০০ সৈন্য। এদেশের চূড়ান্ত আধিপত্য একটি মেয়ের। রানির শাসন। এই রানির স্বামী কিন্তু রাজা নয়—দেশের শাসন-ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। এ-দেশে প্রভূত পরিমাণে তামা, সিঁদুর, মৃগনাভি, নুন আর তিব্বতি গোরু হয়; তাই নিয়ে ওরা ভারতবর্ষে সওদাগরি করতে যায়— সওদাগরিতে প্রচুর লাভ। ওদের মধ্যে মায়ের বংশ অনুসারেই সন্তানদের বংশপরিচয়। পুরুষ চাকরেরা ধনী মেয়েদের সেবায় নিযুক্ত থাকে—এই পুরুষ চাকরেরাই মনিবানীদের চুল আঁচড়ে দেয়, মুখে রং মাখিয়ে দেয়। রানির কয়েক শো অনুচর থাকে। প্রতি পাঁচ দিনে একবার করে রানির দরবার বসে; সে-দরবারে পুরুষদের নানারকম বাইরের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু সেসব দায়িত্ব পালন করবার সময় পুরুষেরা নেহাতই মেয়েদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

কয়েক শো বছর আগে পর্যন্ত উত্তর-তিব্বতে ওইরকম মেয়েদের রাজত্ব : খাসিয়াদের কথা আলোচনা করবার সময় আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে কোথাও কোথাও আজও এই রকম মেয়েদের যুগ টিঁকে আছে।

তিব্বত থেকে আফ্রিকায় যাওয়া যাক। অগোন্না, লটুটকা,ইউবেম্‌বা প্রভৃতি বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে দেখা যায় রাজা বলে কেউ নেই। তাদের মধ্যেও আজও রানির শাসন।

রানির শাসন ভেঙে রাজার শাসন ফুটে ওঠবার মাঝামাঝি অবস্থাটা কীরকম? তারও পরিচয় পাওয়া যায় আফ্রিকার অন্যান্য কোনো কোনো অঞ্চলে। তাদের মধ্যে দেখা যায় রাজার হাতে শাসনক্ষমতা আসছে, কিন্তু তবুও রানির শাসনের বেশ খানিকটা রেশ থেকে গিয়েছে। যেমন ধরা যায় বগণ্ডাদের কথা। তাদের মধ্যে অবশ্য রাজাই সর্বেসর্বা হর্তাকর্তাবিধাতা। কিন্তু তবুও, যেটা খুবই বিস্ময়ের কথা, এই রাজা দুটি

মেয়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য। একজন হলো রানি। আর-একজন হলো রাজার মা। দুজনকেই রানি বলা হয়। দুজনেরই নিজস্ব রাজ-দরবার আছে আর এমনকি নিজস্ব লোক-লস্কর কর্মচারী প্রভৃতি আছে। রানিমার দৈনিক কর্তব্যের মধ্যে একটি হলো রাজাকে খেতে দেওয়া। ওদের ধারণায়, এই রানিমার মৃত্যু রাজার পক্ষে সাংঘাতিক সর্বনাশের ব্যাপার–তাঁর উপর নির্ভর করতে না পারলে রাজা বাঁচবেন কী করে? তাই, রানিমা যদি হঠাৎ মারা যান তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই বংশ থেকে অপর কোনো মেয়েকে রানিমার পদে অভিষেক করে নেওযার ব্যবস্থা করা হয়।

তা হলে, এদের বেলায় দেখা যাচ্ছে রাজার হাতে– পুরুষের হাতে –ক্ষমতা আসছে; কিন্তু তবুও মাতৃপ্রাধান্যের রেশ উঠে যায়নি। তাই এই অবস্থাকে মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজের দিকে এগোবার মাঝামাঝি কোনো অবস্থাই বলতে হবে।

মাতৃপ্রাধান্য ভাঙছে, তবুও মাতৃপ্রাধান্যের রেশ টিঁকে থাকছে– এই অবস্থারই আরো একটি আশ্চর্য পরিচয় আমরা ওই বগাণ্ডাদের মধ্যেই দেখতে পাই। কীরকম পরিচয়? তা হলে, রানিমার কথা ছেড়ে এবার খোদ রানিটির কথা ভেবে দেখা যাক। রাজদরবারে রাজার সঙ্গে তার সমান সম্মান, দুজনে বসবে একই সিংহাসনের উপর। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যবস্থা হলো এই যে, খোদ-রানি আবার রাজার খোদ-বোনও– রানিমা রাজার বোনদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেবে আর এইভাবেই রাজার এক বোন রানি হয়ে যাবে।

এ-হেন একটা ব্যবস্থার কথা শুনলে আমরা নিশ্চয়ই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবো। কিন্তু আমরা যদি কোনোমতে প্রাচীন মিশরে চলে যেতে পারতাম তা হলে দেখতাম সেদেশের সে-যুগের লোকেরা এ-হেন একটা ব্যবস্থার কথা শুনে মোটেই অবাক হচ্ছে না্ কেননা, তাদের দেশেও ফেয়ারো বলে রাজাদের বেলায় রাজা-রানির সম্বন্ধটা ভাই-বোনের সম্বন্ধও। শুধুমাত্র রানির ছেলেমেয়েরাই ছিলো রাজবংশের মানুষ; রাজার ছেলে যাতে রাজত্ব পায় এই ব্যবস্থা করার জন্যে রাজার পক্ষে প্রয়োজন ছিলো এইরকম রাজবংশেরই কাউকে– অতএব রানিমারই কোনো

মেয়েকে– বিয়ে করা, কিংবা, রানিমার কোনো বোনের মেয়েকে বিয়ে করা। প্রাচীন মিশরের রাজবংশে তাই ওই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়–ভাইয়ের সঙ্গে বোনের বিয়ে!

এরকম সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা কেন? মানুষগুলো পাগল ছিলো নাকি? আসলে তা নয়। যদি একটু ভালো করে ভাবতে রাজি হও তা হলে বুঝতে পারবে এই ব্যবস্থাটির মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজেরই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মাতৃপ্রধান সমাজ হলে রাজবংশের উত্তরাধিকারী হতো রাজবংশের মেয়েরাই; প্রাচীন মিশরে দেখা যাচ্ছে রাজবংশের ছেলে রাজত্ব পাচ্ছে,– কিন্তু রাজবংশের ছেলে হিসেবে নয়, রাজবংশের মেয়ের স্বামী হিসেবে। এদিক থেকে তাই মিশরের ব্যবস্থায় মাতৃপ্রাধান্যের চিহ্ন রয়েছে–মেয়েদের সূত্রে রাজত্বের উত্তরাধিকার হচ্ছে। কিন্তু আবার মাতৃপ্রধান সমাজের ভাঙনের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে, কেননা রাজবংশের মেয়েরা সরাসরি রাজত্বের অধিকারী থাকছে না, তার বদলে বংশের ছেলেরাই রাজত্বের অধিকারী হচ্ছে। কিংবা, ব্যাপারটাকে এইভাবেও বোঝবার চেষ্টা করা যায় : রানির মেয়ে রানি হবে– এই পুরোনো ব্যবস্থাটি বদলাবার প্রথম ধাপ হিসেবে ওরা ব্যবস্থা করলো রানির ছেলেমেয়ে দুজনেরই রাজত্বে অধিকার থাকবে আর দুজনে যাতে আলাদা হয়ে না যায় তাইজন্যে দুজনের মধ্যে বিয়ে দেওয়া হবে।

মাতৃপ্রধান সমাজ বদলে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টায় প্রাচীন রোমানরা কী ব্যবস্থা করেছিলো তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রোমানদের মধ্যে সম্পত্তিতে সরাসরি ছেলের অধিকার দেখা দেয়নি– তার বদলে, অধিকার জন্মালো জামাইয়ের, মেয়ের বরের। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সম্পত্তি অন্য বংশের লোকের হাতে চলে যায়– জামাই অন্য বংশের লোক। প্রাচীন মিশরের রাজারানির বেলায় যে-ব্যবস্থা হলো তাতে আর ও-হাঙ্গামা রইলো না। কেননা, মেয়ের স্বামী,– জামাই,– অন্য বংশের মানুষ নয়, মেয়েরই ভাই।

তা হলে প্রাচীন মিশরের ওই কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপারটির–ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হওয়ার ব্যবস্থাটির– আসল ব্যাখ্যা কী? তখনো ওদের মধ্যে মাতৃপ্রধান সম্পর্কের রেশটা খুব জোরই হয়ে রয়েছে, কিন্তু

তারই মধ্যে সম্পত্তিতে পুরুষের অধিকার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এই দুটি দিকের মধ্যে একটা আপস বজায় রাখবার চেষ্টাতেই ওরা ওইরকম কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা করেছিলো।

প্রাচীন মিশর ছেড়ে এবার প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার দিকে এগুবার চেষ্টা করা যাক। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় যেসব সভ্যতার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো সেগুলিকে পরীক্ষা করে কি আমরা মাতৃপ্রাধান্যের ভাঙা-চোরা চিহ্ন উদ্ধার করতে পারি? পারি। দু-একটা নমুনা দেখা যাক।

প্রাচীন সুমেরিয়ার নগরগুলিতে শাসক বলতে দুরকম লোক : পুরোহিত আর রাজা– ওদের ভাষায় পটেসি আর লুগাল। সুমের-ইতিহাসের একেবারে প্রথম যুগে লগস্ বলে নগরে একজন বিখ্যাত পুরোহিত-শাসকের নাম হলো লুগালনাভা। কিন্তু তার চেয়ে তার স্ত্রী বরনম্‌টররা-র নাম কম বিখ্যাত নয়। কেননা এই স্ত্রীটি তার স্বামীর সঙ্গে মিলে যুক্তভাবে নগর-শাসন করতো। স্বামীর যেরকম নিজের দরবার ছিলো স্ত্রীরও তেমনি নিজের আলাদা দরবার ছিলো, তার নাম নারী-সভা।

উরুকাগ্নিয় বলে আর-এক পুরোহিত-শাসকের স্ত্রীর নাম ছিলো শগ্ শগ্– তারও প্রভাব-প্রতিপত্তি আর শাসনক্ষমতা খুব কম ছিলো না। এই স্ত্রীটির উপাধি ছিলো ‘দেবী বাউ’।

লুগালন্‌ভার প্রধানমন্ত্রীকে বলা হতো নারী-সভার কেরানি। উরুকাগ্নিয়র প্রধানমন্ত্রীকে বলা হতো ‘দেবী বাউ’-এর কেরানি। এর থেকে মনে হয়, এই অবস্থায় শাসনক্ষমতা পুরোপুরিভাবে পুরুষ-পুরোহিতদের হাতে এসে পড়েনি। আসল ক্ষমতা মেয়েদেরই হাতে এবং এ-অবস্থায় স্বামীরা অনেকাংশেই স্ত্রীদের অনুচরের মতো।

মরখাসি বলে সুমেরিয়ার আর-এক নগর সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায় যে সেখানে পুরোহিত-শাসক বলতে একটি মেয়েই।

অবশ্য একথা ঠিক যে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় এইরকম মাতৃপ্রাধান্যের চিহ্ন খুব বেশি পাওয়া যায় না। তার কারণ কিন্তু এও হতে পারে যে অতোদিন আগেকার সেসব চিহ্ন আজকের দিনে হারিয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন গ্রিসের বেলায় কীরকম? গ্রিক-ইতিহাসেরও পিছনের পর্যায়ে মাতৃপ্রধান সমাজ সে সত্যিই ছিলো, একথা অধ্যাপক জর্জ টমসন বলে একজন মস্ত বড় আধুনিক পণ্ডিত খুব দীর্ঘভাবেই প্রমাণ করেছেন। আমাদের পক্ষে এখানে তাঁর এই গবেষণার কথা উল্লেখ করেই খুশি থাকতে হবে; কেননা এতোটুকু বইতে সব কথা আলোচনা করার তো আর জায়গা হবে না।

মোহেনজোদারোর কথা

পৃথিবীর এইসব নানান জায়গা পরীক্ষা করে এবার এসো আমাদের নিজেদের দেশে ফিরে আসা যাক।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতার যে-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তার নাম সিন্ধু সভ্যতা। হরপ্পা আর মোহেনজোদারো বলে দুটি আশ্চর্য নগরের ধ্বংসাবশেষের কিছু-কিছু কথা 'যুগের পর যুগ' গ্রন্থমালার আগের বইতে বলেছি। এখানে আমরা প্রশ্ন তুলবো, ভারত-বর্ষের এই যে প্রাচীন সভ্যতার ঘাঁটি, এখানেও কি ওই মা-বড়ো যুগের কোনো পরিচয় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?

খাসিয়াদের অবস্থা আলোচনা করে মা-বড়ো সমাজের কতকগুলি লক্ষণকে চেনবার চেষ্টা করেছি; বংশপরিচয়ের ব্যবস্থা, শাসনক্ষমতা, উত্তরাধিকার-সূত্র, ইত্যাদি। কিন্তু হরপ্পা-মোহেনজোদারো নিয়ে সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হলো এই যে ওখানকার লিপি এখনো কেউই পড়তে পারেননি, তাই আজো আমাদের কাছে সিন্ধু সভ্যতার অনেক কথাই অজানা-অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।

ওই সিন্ধু সভ্যতায় বংশপরিচয়ের ব্যবস্থাটা কীরকম ছিলো? শাসনব্যবস্থায় মাতৃপ্রাধান্যের কোনো লক্ষণ ছিলো কি? উত্তরাধিকার-ব্যবস্থাই-বা কোন ধরনের ছিলো? সত্যি বলতে, এসব প্রশ্নের নিখুঁত জবাব কারুরই জানা নেই।

তা হলে? মা-বড়ো যুগের কোনো পরিচয়, কোনো স্মৃতিচিহ্ন কি আমরা ওই হরপ্পা-মোহেনজোদারো থেকে আবিষ্কার করতে পারি না? পারি। কোন ধরনের চিহ্ন? সেই কথটা খুলে বলি।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেক পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলি হলো নারীমূর্তি। পণ্ডিতেরা বলছেন, এর মধ্যে কিছু-কিছু মূর্তি খেলার পুতুল হলেও হতে পারে। কিন্তু সমস্তই খেলার পুতুল যে হতে পারে না সে-বিষয়ে নানান প্রমাণ রয়েছে। তা হলে ওগুলি কিসের মূর্তি? দেবীমূর্তি! বসুমাতা দেবী। আর এই বসুমাতা দেবীদের মূর্তি থেকেই প্রমাণ যে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই সিন্ধু সভ্যতার নিচেও একটা মা-বড়ো যুগের পরিচয় চাপা রয়েছে। স্যার জন মার্শাল বলে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তা হলে সিন্ধু সভ্যতার ওই মাতৃমূর্তিগুলির সাক্ষ্য সত্যই খুব আশ্চর্য নয় কি?

ভারতীয় সভ্যতার কথা

এবার সংক্ষেপে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভেবে দেখা যাক।

আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরোনো সাহিত্যের নাম বেদ। অনেকদিন পর্যন্ত পণ্ডিতদের মত ছিলো, যাঁরা এই বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরাই বুনো আর অসভ্য ভারতবাসীদের সভ্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার চিহ্নগুলি আবিষ্কার হবার পর খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা গেলো যে আগেকার ওই ধারণাগুলি নেহাতই ভুল। কেননা, বেদ-রচনা হবার অন্তত কয়েক হাজার বছর আগেই এদেশের মানুষ হরপ্পা আর মোহেনজোদারোর মতো নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। তাই, যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন ভারতীয় সভ্যতা বলতে সবটুকুই যে তাঁদের অবদান একথা মনে করার কারণ নেই।

এ নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু আমরা এখানে মা-বড়ো সমাজের দিক থেকেই ভারতীয় সভ্যতার কথাটা বোঝবার চেষ্টা করবো।

বৈদিক মানুষদের কথাটা আগে ভেবে দেখা যাক। জীবনধারণের প্রধান উপায় বলতে তাঁদের কাছে কী? পশুপালন। তাঁরা চাষবাস জানতেন কি-না, এবং জানলেও কতখানি পর্যন্ত জানতেন– এ নিয়ে তর্ক

আছে। কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের কাছে চাষবাস প্রধানতম জীবনোপায় নিশ্চয়ই ছিলো না। তার বদলে ছিল প্রধানতম জীবনোপায় বলতে পশুপালন।

যদি তা-ই হয় তা হলে তাঁদের সমাজের চেহারাটা কীরকম হবে? পিতৃপ্রধান। পুরুষপ্রধান। সে-সমাজের মানুষ যে-দেবলোকের কল্পনা করবে সেখানে দেবতারা বড়ো, না দেবীরা বড়ো? নিশ্চয়ই দেবতারা, পুরুষেরা– খাসিয়াদের ঠিক উলটো। আর বেদ নামের ওই সাহিত্য পড়লে দেখা যায় সত্যিই তা-ই। সে-সাহিত্যের কোথাওই যে কোনো দেবীর উল্লেখ নেই তা নয়; কিন্তু যে-দুচারজন দেবীর কথা পাওয়া যায় পুরুষদেবতাদের পাশে তাঁরা যেন নেহাতই নগণ্য। কেবল, ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত বলে এক জায়গায় দেবীর খুব গৌরব-বর্ণনা দেখা যায়; কিন্তু এই অংশটি অনেক পরের যুগে লেখা–অনেক পরের যুগেই এইটিকে ঋগ্বেদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর এছাড়া কোথাও দেবীর মাহাত্ম্য দেখতেই পাওয়া যায় না।

বৈদিক দেবলোকে প্রধান বলতে কারা? ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পূষণ, অগ্নি, সূর্য, মাতরিশ্ব– এইরকম আরো অনেক। আর এঁরা সকলেই পুরুষ–দেবী নন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত বলে আর-এক জায়গায় বলা হচ্ছে, এক আদি পুরুষ থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি, সবকিছুর জন্ম।

এই হলো পশুপালন-প্রধান মানুষদের পুরুষপ্রধান দেবলোক।

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা বলতে বাস্তবভাবে যা বোঝায় তার সঙ্গে ওই বৈদিক দেবলোকের সম্পর্ক সত্যিই কতটুকু? খুব কম। আমাদের বাঙলাদেশের কথাটাই ভেবে দেখা যাক। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী,–আরো কত। এঁরা দেবী, দেবতা নন। এবং বেদের দেবলোকের সঙ্গে এঁদের খুব কিছু সম্পর্ক নেই। বাস্তবভাবে দেখলে আমরা জানতে বাধ্য হবো, দেশের মানুষের মনে বেদের ওই পুরুষ দেবতারা সত্যিই ঠাঁই পাননি। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, পূষণ, মাতরিশ্ব, অগ্নি–এঁদের নিয়ে মাথা ঘামান শুধু পণ্ডিতেরা।

খাসিয়াদের নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখেছি, দেবলোকের কথাটা কতোখানি জরুরি। আমরা দেখেছি, ওই দেবলোকে

যখন দেবীদের মাহাত্ম্য পুরুষদেবতাদের মাহাত্ম্যকে ছাপিয়ে ওঠে তখন সন্দেহ করতে হবে যে তার পিছনে আসলে মা-বড়ো সমাজের স্মৃতি লুকোনো আছে।

ভারতীয় সভ্যতা বলতে বাস্তবে যা বোঝায় তার মূলে একটা এইরকম মা-বড়ো সমাজের ইতিহাস থাকবার কারণটাও অস্পষ্ট নয়, কেননা, সাধারণভাবে এদেশের মানুষ তো আর পশুপালনের উপর নির্ভর করেনি। তার বদলে প্রধানতই নির্ভর করেছে চাষবাসের উপর। আর ওই কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, কৃষিকাজকে অবলম্বন করে যে-সমাজ গড়ে উঠেছিলো সেখানে মেয়েরা বড়ো, মায়েরা বড়ো।

হরপ্পা-মোহেনজোদারোর প্রধান সম্পদ বলতে চাষের ফসল। তাই এই সভ্যতার তলায় একটা মাতৃপ্রধান সমাজের পরিচয় ঢাকা পড়ে থাকবারই কথা। ওখান থেকে খুঁজে-পাওয়া পোড়ামাটির বসুমাতা মূর্তিগুলি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু শুধু সিন্ধু সভ্যতার কথাই নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তারও অনেকখানিই ভরা রয়েছে ওই মা-বড়ো সমাজের চিহ্ন দিয়ে।

এদিক থেকে ভাবলে মানতে হবে, ভারতীয় সভ্যতার কথাটা আরো অনেক ভালো করে, নতুন করে বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। কেননা, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বলতে সাধারণত যা লেখা হয় তার মধ্যে ওই মা-বড়ো যুগের চিহ্নগুলিকে এখনো তেমন ভালো করে মূল্য দেওয়া হয় না। সেই চিহ্নের মধ্যে আমি এখানে শুধুই ভারতীয় দেবদেবীদের কথাই বললাম; কিন্তু আরো অনেকরকম চিহ্ন রয়ে গিয়েছে।